অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং একজন বাবাসাহেব

-রণদীপম বসু

...

কলঙ্ক

খুব বেশিকাল আগের কথা নয়, একসময় সাধারণ পৌর শহরগুলোতেই কিছু কিছু ভ্রাম্যমান নারী-পুরুষ দেখা যেত যাদের কোমরে অনিবার্যভাবে বাঁধা থাকতো একটি ঝাড়ু, আর গলায় বা কোমরে ঝুলানো থাকতো একটি টিনের মগ জাতিয় পাত্র। ঝাড়ুটি হলো তার পেশাগত প্রতীক বা পরিচয়। তাদের কাজ হচ্ছে লোকালয়ের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে শহরটিকে পরিচ্ছন্ন রাখা। পেশাগতভাবে এরা পৌর-কর্তৃপক্ষের শুধু যে বেতনভুক কর্মচারী তা-ই নয়, সম্প্রদায়গতভাবেও এদের পেশাটা তা-ই। সামাজিক শ্রমবিন্যাস অনুযায়ী তাদের জন্য অন্য পেশা বরাদ্দ ছিলো না। তাই জন্মগতভাবে বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ পেশাই তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। আর সাথের মগটি ছিলো তাদের সামাজিক অবস্থানের এক ভয়াবহ অস্পৃশ্যতার প্রতীক। অর্থাৎ সব ধরনের ছোঁয়াছুয়ির উর্ধ্বে থেকে অন্য কাউকে যাতে কোনরূপ অশূচি হবার বিড়ম্বনায় পড়তে না হয় সেজন্যেই এ ব্যবস্থা। পানির তেষ্টা পেলে কোন হোটেল বা চা-দোকানের বাইরে থেকে মগটা বাড়িয়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দোকানের কেউ হয়তো নিরাপদ অবস্থান থেকে ওই মগটিতে পানি ঢেলে দিতো। এমনকি কোন পাবলিক টিউবওয়েলে ছোঁয়ার ঝুঁকি না নিয়ে এরা অপেক্ষায় থাকতো দয়া করে কেউ যদি টিউবওয়েল চেপে কিছুটা পানি ঐ মগে ঢেলে দেয়। কিংবা টাকা দিয়ে দোকান থেকে চা খেতে চাইলেও চায়ের কাপ স্পর্শ করার অধিকার নেই বলে গরম চা ওই মগেই ঢেলে দেয়া হতো। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অন্য লোকজনের সাথে এক কাতারে বসার তো প্রশ্নই উঠে না! নিরাপদ দূরত্ব বাঁচিয়ে মাটিতে বসে পড়াটাই তাদের জন্য অনুমোদিত ব্যবস্থা। তারপরও তাদের ছোঁয়ায় ঐ স্থানটা নোংরা হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল থাকতো সবসময়। এরা হলো ধাঙড়, মেথর বা সুইপার। তাদের বসবাসের ব্যবস্থাও সেরকমই। ভদ্রপাড়া থেকে দূরে স্বতন্ত্র কোন বস্তি বা পল্লীতে এদের

গোষ্ঠিগত বসবাস। এদের সংস্কৃতি ভিন্ন, জীবনধারা ভিন্ন, উৎসব-উদযাপন সবই ভিন্ন এবং অনিবার্যভাবে গোষ্ঠিগত।

এদেরই একটি অংশ আবার চর্মকার বলে পরিচিত, ভাষার অপভ্রংশতায় যাদেরকে চামার বলে ডাকা হয়। যারা মূলত মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ থেকে শুরু করে জুতো বা চামড়া জাতিয় দ্রব্যাদি তৈরির সাথে জড়িত। এরা সমাজের অনিবার্য অংশ হয়েও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। সমাজের যে কোন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এদের শ্রমের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার এদের নেই। এধরনের আরো বহু সম্প্রদায় রয়েছে আমাদের সমাজে একই রকম অস্পৃশ্য। স্বভাবতই অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত নাগরিকদের বাসস্থান শহরের চিত্র থেকে যদি আমাদের দৃষ্টিটাকে দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই, তাহলে এই বাস্তবতাই আরো অনেক কঠিন ও তীব্র হয়ে দেখা দেবে। কেননা গ্রামের সামাজিক কাঠামোতে জীবিকার উৎস আরো অনেক বেশি সঙ্কুচিত বলে এসব অস্পৃষ্য সম্প্রদায়গুলোর মানবেতর জীবন-ধারণ খুবই শোচনীয় পর্যায়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের বসবাস থাকে গ্রামের বাইরের দিকে অত্যন্ত অবহেলিতভাবে অবস্থায়। দেখতে শুনতে চেহারায় আকারে অন্য বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর মতো হয়েও কেন এরা সামাজিকভাবে এতো অস্পৃশ্য অপাঙক্তেয় ? যুগে যুগে এ প্রশ্নটা যে উত্থাপিত হয়নি তা নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এদের পেশার অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ ইদানিং জীবিকার তাগিদে ভাগ বসালেও এই অস্পৃশ্যদের জন্য অন্য পেশায় জড়িত হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয়নি আজো। কারণ অস্পৃশ্যতা এদের গা থেকে মুছে যায়নি বা মুছা হয়নি। অথচ তাদের পেশায় ভাগ বসালেও অন্য সম্প্রদায়কে কিন্তু এই অস্পৃশ্যতার দায় বইতে হয় না। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সমাজ নিয়ন্ত্রিত এই অস্পৃশ্যতার দায় আসলে পেশা বা কর্মগত নয়, সম্পূর্ণই জন্মগত একটা অভিশাপ। কর্মদোষ নয়, জন্মদোষটাই এখানে একমাত্র উপাত্ত। কিন্তু সমাজ বা সামাজিক ব্যবস্থা কি চাইলেই কোন সম্প্রদায়কে অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য বানিয়ে দিতে পারে ? প্রশ্নটা যত সহজে করা যায়, উত্তরটা বোধ করি তত সহজ বা সাবলীল নয়। এর পেছনে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার বছরের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো তৈরিতে যে ধর্মীয় বর্ণাশ্রমগত নিপীড়নের ইতিহাস তথা মানব-দলনের যে ঐতিহ্য বা কালো অধ্যায় মিশে আছে তার শিকড় এতোটাই গভীরে প্রোথিত যে, গোটা সামাজিক সত্তাটাই বুঝি এই বর্ণবাদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছে। অর্থাৎ আচারে বিচারে জীবনে যাপনে সামাজিকতায় এই ধর্মীয় বর্ণবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজকে বা সমাজের কোন অংশকে পৃথক করা শরীর থেকে চামড়া আলগা করার মতোই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। চামড়ার কোথাও একটু টান পড়লে গোটা শরীরটাই আৎকে ওঠে, বিগড়ে যায়। তাই বলে কি এই সভ্য জগতের তথাকথিত সভ্য মানুষদেরকেও এভাবেই হাজার বছরের কলঙ্ক বয়ে বয়ে যেতে হবে ?

সভ্য মানুষরা তা বয়ে যাচ্ছে বৈ কি ! কেননা আজো যারা এই সমাজ সংসারের অধিকর্তা হিসেবে জন্মগতভাবে মহান উত্তরাধিকার বহন করছে, সেইসব ক্ষমতাসীন উচ্চবর্ণীয়দের অনুকূল এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে পাল্টানোর খায়েশ তাদের হবেই বা কেন ! কিন্তু সমাজের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়েও একটা আরোপিত ব্যবস্থায় কেবল জন্মগত কারণে নিম্নবর্ণীয় বা অস্পৃশ্য হবার অভিশাপে যাদের সমস্ত অর্জন কুক্ষিগত হয়ে চলে যায় অন্যের অধিকারে, তারা এটা মানবেন কেন ? আসলে এরা কখনোই মানেনি তা। ক্ষমতাহীন এই না-মানার প্রতিবাদ-বিদ্রোহকে তাই দমন করা হয়েছে বড় নিষ্ঠুরভাবে, নির্দয় প্রক্রিয়ায়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সে সাক্ষ্যই দেয় আমাদেরকে।

বৈদিক আধিপত্য

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, মুঘলদেরও বহুকাল আগে প্রাচীন আর্যরা এই ভারতবর্ষে শুধু বহিরাগতই ছিলো না, এই আর্যরা আাদিনিবাসী জনগোষ্ঠি ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির উপরও চালিয়েছিলো ব্যাপক আক্রমণ। আর এই আক্রমণেই একদিন ধ্বংস হয়ে যায় এসব আদিনিবাসী জনগোষ্ঠির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ সিন্ধু সভ্যতা। এই সিন্ধু সভ্যতাকেই কেউ কেউ হরপ্পা সভ্যতা বা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। আক্রমণকারী আর্যরা আদিনিবাসী জনগোষ্ঠিকে দাসে পরিণত করার লক্ষ্যে যে চতুর্বর্ণ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে, শেষপর্যন্ত এতে সফলও হয় তারা। ফলে এককালের সিন্ধুসভ্যতার আদিনিবাসী জনগণই হয়ে যায় তাদের কাছে অনার্য অর্থাৎ শাসিত অধম। আর্যরা হয়ে ওঠে মহান শাসক। আর তাদের প্রচলিত বৈদিক ধর্ম হয়ে ওঠে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক সত্ত্বা। এই বৈদিক ধর্মের উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয় স্মৃতি বা বেদ নামের মহাগ্রন্থ। আর এই বেদের নির্যাস নিয়েই আরোপিত এই ধর্মটির প্রচারিত সংবিধান হয়ে ওঠলো মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। এর মাধ্যমে যে সমাজ-কাঠামোর নির্মাণ যজ্ঞ চলতে থাকলো তার ভিত্তি এক আজব চতুর্বর্ণ প্রথা। যেখানে আদিনিবাসী অনার্যরা হয়ে যায় নিম্নবর্ণের শূদ্র, যারা কেবলই উচ্চতর অন্য তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের অনুগত সেবাদাস। কোনো সমাজ-সংগঠনে বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান যজ্ঞে অংশগ্রহণের অধিকার শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর যারা এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে প্রতিবাদী-বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলো, এদেরকেই সুকৌশলে করা হলো অছ্যুৎ, দস্যু, সমাজচ্যুত বা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। চাতুর্যপূর্ণ চতুর্বর্ণের এই অসম সমাজ ব্যবস্থার কুফল সমাজে গভীরভাবে সংক্রমিত হতে থাকলে এই মাটির সন্তান শাক্যমুণি গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। গৌতম বুদ্ধ (Buddha) এ দেশেরই আদিনিবাসী হওয়ায় তাঁর এই সামাজিক বিদ্রোহে আদিনিবাসী অনার্য জনগোষ্ঠি তাঁকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানায়। ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে দ্রুত। এবং বুদ্ধের নির্বাণলাভ বা মৃত্যুর পর আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম। গোটা উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বুদ্ধের অহিংসা পরম ধর্মের ডাক।

মৌর্য সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট মহামতি অশোকের (৩০৪-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্বকালকেই (২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। গৌরবময় আর্যসম্রাট হয়েও মহামতি অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধের (খ্রিস্টপূর্ব ২৬১) ভয়াবহ রক্তপাত, আহত-নিহতের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও যুদ্ধের বীভৎসতায় বিচলিত হয়ে যান। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখে তিনি বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের মানবাধিকারহীন অসহিষ্ণুতা আর যুদ্ধের পথ ত্যাগ করে তিনি বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মকেই তাঁর আচরিত ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অহিংসার পথে সাম্রাজ্য পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন। এরপর অশোক দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠান। জানা যায় তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে শ্রীলংকা পাঠান। এছাড়া তিনি কাশ্মীর, গান্ধার, ভানাভাসী, কোংকন, মহারাষ্ট্র, ব্যকট্রিয়, নেপাল, থাইল্যান্ড, ব্রহ্মদেশ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করান।

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর আবারো ব্রাহ্মণ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপর নেমে আসে দলন-পীড়ন। ব্রাহ্মণ্যবাদের কালো থাবার নিচে প্রকৃতই চাপা পড়ে যায় আদিনিবাসী অনার্য জনগোষ্ঠির উজ্জ্বল আগামী। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে দীর্ঘকালব্যাপী ব্রাহ্মণ্যবাদের এই অত্যাচার নির্যাতন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের কোমরটাই ভেঙে দেয়। শেষপর্যন্ত যাঁরা বেঁচে গেলো তারাও এ দেশ থেকে বিতারিত হলো। ইতিহাস গবেষক মনীন্দ্র মোহন বসু এ প্রসঙ্গে লিখেন-

> ‘অবশেষে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমত তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে যাইয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের এই পরাজয় এত সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, ধর্মের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থসমূহও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। থেরবাদী সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলো সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর মহাযান মতের শাস্ত্রসমূহ পাওয়া গিয়াছে প্রধানত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে। চর্যাপদের পুঁথি নেপালে আবিষ্কার হইয়াছিল। আর ইহার অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তিব্বতী ভাষায়। এখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সমাধির স্মৃতিচিহ্ন মাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।’

উল্লেখ্য হীনযান বা থেরবাদী মত ও মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমত বৌদ্ধধর্মেরই দুটি শাখা।

অধ্যাপক হরলাল রায় চর্যাগীতি গ্রন্থে লিখেন-

> ‘ধর্ম কোলাহলেই বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশ। ভারতেই আমরা দেখতে পাই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পালি সাহিত্যের সৃষ্টি। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণেই বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে বিতাড়িত হয়েছিল। ... বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি ভারতে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল। যারা সংস্কৃতকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, তাদের পক্ষে যে অন্য ভাষা সহ্য করা অসম্ভব ছিল, তা মনে করা যুক্তিযুক্ত। সর্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম শক্তিশালী অনার্য সভ্যতাকে কুক্ষিগত করে। এ সময়ে বৌদ্ধ সমাজের বুদ্ধিজীবীরা রিক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ভারত থেকে তিব্বত ও আসামের দিকে সরে পড়েছেন।’

অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি জাতিভেদমূলক ব্রাহ্মণ্যবাদী চতুর্বর্ণ প্রথার নিগড়ে ভারতের মাটিবর্তি অহিংস বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকাল যাবৎ নিগৃহিত হতে হতে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় পতিত হলো। যদিও চীন ও জাপান সহ অনেকগুলো দেশের কোটি কোটি মানুষ বুদ্ধের অহিংস ধর্ম গ্রহণ করে ততদিনে বৌদ্ধ হয়ে গেলেন, ভারতবর্ষ রয়ে গেলো এক বিদ্বেষপূর্ণ অমানবিক বর্ণবাদী বিষাক্ত দর্শনের নিরাপদ প্রজননভূমি হয়ে।

মনুসংহিতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদ

পৃথিবীতে যতগুলো কথিত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে মনে হয় অন্যতম বর্বর, নীতিহীন, শঠতা আর অমানবিক প্রতারণায় পরিপূর্ণ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে ‘মনুস্মৃতি’ (Manu-smriti) বা ‘মনুসংহিতা’ (Manu-samhita)। ব্রাহ্মণ্যবাদের (Hinduism) আকর গ্রন্থ শ্রুতি বা ‘বেদ’-এর নির্যাসকে ধারণ করে যেসব স্মৃতি বা শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে কথিত, তার শীর্ষে অবস্থান করছে মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। তাই মনুসংহিতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। মনুসংহিতা মানেই ব্রাহ্মণ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ মানেই মনুসংহিতা। এটাকে তৎকালীন বৈদিক আর্য সমাজ ও প্রচলিত হিন্দু সমাজের অবশ্য পালনীয় পবিত্র সংবিধান বা সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ জীবনাচরণবিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বারোটি অধ্যায়ে প্রায় দুহাজার সাতশত শ্লোক সংবলিত এ গ্রন্থটির পাতায় পাতায় ধর্মীয় বিধানের নাম দিয়ে সংস্কৃত অক্ষরে অক্ষরে যে শ্লোকগুলো উৎকীর্ণ রয়েছে, অধিকাংশ শ্লোকের ভাবার্থকে যদি মনুষ্য সমাজে পালনীয় নীতি হিসেবে বিবেচনা করতে হয়, তাহলে মানুষের সমাজে কোন মানবিক বোধ আদৌ রয়েছে বা অবশিষ্ট থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করাটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়। এ ব্যাপারে কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যায় না গিয়ে বরং মনুসংহিতা থেকে অনুবাদ ও ভাবার্থসহ কিছু শ্লোকের নমুনা-উদাহরণ টানলেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

উল্লেখ্য, মনুসংহিতাকে পরিপূর্ণ একটি ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এজন্যে যে, এই গ্রন্থে বিশ্বজগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুনিচয়, গোটা প্রাণীকূল, উদ্ভিদ, গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবী, আলো-জল-হাওয়া, দিন-রাত্রি-সময়-কাল-যুগ, জীব-জগতের উৎস, স্বভাব-চরিত্র-জীবনযাপন, গুণ ও দোষবাচক সমস্ত অনুভব-অনুভূতি, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক, জীবলোক-মৃতলোক, সাক্ষি-বিচার-শাসন, আচার-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, খাবার-খাদ্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, শূচি-অশূচি ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুগত ও ভাবগত বিষয়ের সৃষ্টিরহস্য ব্যবহার-বিবেচনা বর্ণিত হয়েছে কল্পনার সমৃদ্ধ শিখরে অবস্থান করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। কথিত হয় যে মহান স্রষ্টা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, এ সবকিছু রক্ষার জন্য তাঁর মানব সৃষ্টিও জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে মানুষও সৃষ্টি হলো। কিন্তু মানব সৃষ্টি ও পরিপালনের ক্ষেত্রে এসে ব্রহ্মা বা ঈশ্বর বোধ করি নিজেকে আর সুমহান মর্যাদায় ধরে রাখতে পারেন নি। যে শ্রেণীবিদ্বেষপ্রসূত তীব্র অসমতাভিত্তিক বর্ণপ্রথার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তাতেই সন্দেহ গাঢ় হয়ে ওঠে যে এটা আদৌ কোন অতিলৌকিক পবিত্র বিধিবিধান কিনা। বরং ধর্মীয় মোড়কে এক ঘৃণ্য আর্থ-সমাজ-রাজনীতির অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক হীন প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়। তার পেছনে যে এক অতীব স্বার্থান্বেষী ভণ্ড প্রতারক গোষ্ঠির সূক্ষ্মতম কারসাজিই কার্যকর হতে পারে, তা বুঝতে খুব বেশি যুক্তিবাদী হবার প্রয়োজন পড়ে না। বিস্তৃত পরিসরে না গিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের নমুনা-উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করে নিতে পারি। এক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদসহ উদ্ধৃত শ্লোক ব্যবহারে সদেশ প্রকাশনী কলকাতা থেকে বইমেলা ১৪১২-এ প্রকাশিত মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মনুসংহিতা' সুলভ সংস্করণ গ্রন্থটির সহায়তা নেয়া হয়েছে।

০১

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে অতঃপর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কি আদতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, না কি কিছু বিভেদপূর্ণ বর্ণ (varnas) (জাতি) সৃষ্টি করলেন, মনুসংহিতা পাঠ করলে তা প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যায়। তবে গোটা গ্রন্থে যেখানে যা কিছুই বলা হয়েছে জাতি হিসেবে ব্রহ্মাসৃষ্ট বর্ণগুলোকেই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

> সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
> মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মাণ্যকল্পয়ৎ।। (১/৮৭)
> বঙ্গানুবাদ: এই সকল সৃষ্টির অর্থাৎ ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য মহাতেজযুক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ– এই চারটি অঙ্গ থেকে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের পৃথক পৃথক কার্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।
>
> অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
> দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।। (১/৮৮)
> বঙ্গানুবাদ: অধ্যাপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (উপহার বা দান-সামগ্রি গ্রহণ)– এই ছয়টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দেশ করে দিলেন।
>
> প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
> বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।। (১/৮৯)
> বঙ্গানুবাদ: প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি, এই কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নিরূপিত করলেন।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ।। (১/৯০)
বঙ্গানুবাদ: পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান-প্রদান করে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃত্তিজীবিকা– টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ– ব্রহ্মা কর্তৃক বৈশ্যদের জন্য নিরূপিত হল ।

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ ।। (১০/১)
বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিনবর্ণের লোকেরা দ্বিজাতি; এঁরা নিজনিজ কর্তব্য কর্মে নিরত থেকে বেদ অধ্যয়ন করবেন । কিন্তু এঁদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই অধ্যাপনা করবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণের পক্ষে অধ্যাপনা করা উচিত নয় । –এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ।

এতমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ।। (১/৯১)
বঙ্গানুবাদ: প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,– তা হলো কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা ।

উপরোক্ত শ্লোকগুলো থেকে আমরা এটা বুঝে যাই যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা গোটা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তো বটেই । তবে এই বিশ্ব-জগৎ সুষ্ঠুভাবে রক্ষাকল্পে তিনি আসলে কোন মানুষ সৃষ্টি করেন নি । চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । এদের আবার দুটো ভাগ– প্রথম তিনটি উচ্চ বর্ণ, আর চতুর্থটি অর্থাৎ শূদ্র হচ্ছে নিম্নবর্ণ, যে কিনা উচ্চবর্ণীয়দের সেবাদাস । আবার ব্রাহ্মণ, যে কিনা কোন শারীরিক শ্রমের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়, সকল বর্ণের শীর্ষে । শুধু শীর্ষেই নয়, ক্ষমতার এতোটাই কল্পনাতীত উচ্চ অবস্থানে অবস্থিত যে, জগতের সবকিছুর মালিক বা প্রভওু হচ্ছে ব্রাহ্মণ । সন্দেহ তীব্র হলে নিচের শ্লোকগুলো দেখা যেতে পারে-

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ।। (১/৯৩)
বঙ্গানুবাদ: ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ থেকে উৎপন্ন বলে, সকল বর্ণের আগে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হওয়ায়, এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ার জন্য (বা বেদসমূহ ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠন করেন বলে)– ব্রাহ্মণই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু ।

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ।। (১/৯৯)
বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পৃথিবীর সকল লোকের উপরিবর্তী হন অর্থাৎ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন । কারণ, ব্রাহ্মণই সকলের ধর্মকোষ অর্থাৎ ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভুসম্পন্ন হয়ে থাকেন ।

সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি ।। (১/১০০)
বঙ্গানুবাদ: জগতে যা কিছু ধনসম্পত্তি সে সমস্তই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য; অতএব সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তিরই প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছেন ।

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ ।। (১/১০১)
বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করে অন্যকে প্রদান করেন, সে সবকিছু ব্রাহ্মণের নিজেরই । কারণ, ব্রাহ্মণেরই আনৃশংস্য অর্থাৎ দয়া বা করুণাতেই অন্যান্য যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করতে পারছে ।

ন তং স্তেনা ন চামিত্রা হরন্তি ন চ নশ্যতি ।
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষবক্ষয়ো নিধিঃ ।। (৭/৮৩)
বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণকে যে ভূমি-অর্থ প্রভৃতি দান করা হয় তা এমনই নিধি (ন্যস্ত সম্পত্তি) যে, সেই নিধি চোরেরা অপহরণ করতে পারে না, শত্রুরা হরণ করতে পারে না, এবং তা নিজেও নষ্ট বা অদৃষ্ট হয় না । এই জন্য রাজার কর্তব্য হল, ব্রাহ্মণগণের কাছে এই অক্ষয় নিধি ন্যস্ত করা ।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে ।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ।। (৭/৮৫)
বঙ্গানুবাদ: অব্রাহ্মণকে যে বস্তু দান করা হয় তার সমপরিমাণ ফল পাওয়া যায়, তার দ্বারা অতিরিক্ত ফল হয় না । ব্রাহ্মণব্রুবকে (অর্থাৎ যিনি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন নন) দান করলে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয় । যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেছেন, তাঁকে দান করলে লক্ষগুণ ফল লাভ হয়; এবং যিনি সমস্ত বেদশাখাধ্যেতা বেদপারগ ব্রাহ্মণ, তাঁকে দান করলে অনন্ত ফল লাভ হয় ।

বুঝাই যাচ্ছে, কথিত ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ হতে সৃষ্ট বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই জগদীশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । অতএব কাউকে কর দিয়ে ব্রাহ্মণের চলার কথা নয় । এবং তা-ই মনুসংহিতার পাতায় পাতায় খুব ভালোভাবে জানান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ।
মনুশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য হিসেবে নিরাপদে রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনেই প্রজাদের কাছ থেকে কর ধার্য্য ও গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে-

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া ।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ।। (৭/১৩৯)
বঙ্গানুবাদ: কর, শুল্ক প্রভৃতি গ্রহণ না করে রাজা নিজের মূলোচ্ছেদন করবেন না অর্থাৎ রাজকোষ শূন্য করবেন না; এবং অতিলোভবশতঃ বেশি কর নিয়ে প্রজাদেরও মূল নষ্ট করবেন না । কারণ, এইভাবে নিজের ও পরের মূলোচ্ছেদ ঘটালে নিজেকে এবং প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করা হয় ।

অতএব কার কাছ থেকে কিভাবে কী পরিমাণ কর আদায় করা হবে তার বিস্তারিত শ্লোক-বয়ান মনুশাস্ত্রে উদ্ধৃত রয়েছে। তবে সাধারণসূত্রে বলা হচ্ছে-

যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্ ।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগজনম্ ।। (৭/১৩৭)

বঙ্গানুবাদ: যে সব 'পৃথগ্জন' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয় ছাড়া অন্য লোক কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কোনও একটি ব্যবহার অর্থাৎ বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কাছ থেকে রাজা বার্ষিক যৎ কিঞ্চিৎ হলেও কর গ্রহণ করবেন।

যে ব্রাহ্মণ কল্পশাস্ত্রের সাথে এক বেদ অথবা ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের সাথে বেদশাখা অধ্যয়ন করেন এবং বেদাধ্যয়নাদি কাজে নিরত থাকেন, তাঁকে 'শ্রোত্রিয়' বলা হয়। উপরোক্ত ৭/১৩৭ সংখ্যক শ্লোকে এই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয়ের কাছ থেকে কোনরূপ কর গ্রহণকে নিরস্ত করা হয়েছে। তবে মনুসংহিতার ১০/১২৯ সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা (পরবর্তীতে নিচে বর্ণিত হয়েছে) শূদ্রের ধন-সম্পদ অর্জনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও শূদ্রের কাছ থেকে কর আদায় নিষিদ্ধ হয়নি। যেহেতু তার অর্জিত সম্পদ থাকার কথা নয়, তাই এই কর পরিশোধ হবে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের মাধ্যমে-

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ।। (৭/১৩৮)

বঙ্গানুবাদ: পাচক, মোদক প্রভৃতি কারুক এবং কাংস্যকার, লৌহকার, শঙ্খকার প্রভৃতি শিল্পী ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী শূদ্র– এদের দ্বারা রাজা প্রতি মাসে একদিন করে নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।

কিন্তু পরধন অর্জনে মত্ত ব্রাহ্মণের কাছে কোনক্রমেই কর নেয়া যাবে না। অর্থাভাবে রাজা মরণাপন্ন হলেও ক্ষতি নেই, তবু কোন ব্রাহ্মণ যেন রাজার রাজ্যে ক্ষুধায় মরণাপন্ন না হন, এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে-

ম্রিয়মাণোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্ ।
ন চ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্ ।। (৭/১৩৩)

বঙ্গানুবাদ: রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কখনও যেন কর গ্রহণ না করেন। রাজার রাজ্যে বাস করতে থেকে কোনও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যেন ক্ষুধায় মরণাপন্ন না হন।

মনুসংহিতার পরতে পরতে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা প্রদান আর নিম্নবর্ণ শূদ্রের নিচত্ব ও তাকে বঞ্চনা করার কৌশল বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, রাজকার্যে ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে সবাইকে উদ্ধারের নিমিত্তে ক্ষমতাসীন পরামর্শক ব্রাহ্মণের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োজনীয় গুণ ও যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক ব্রাহ্মণ হলেই হলো, এবং তা-ই হতে হবে। কিন্তু যত যোগ্যতা বা গুণের আধারই হোক শূদ্রকে কিছুতেই নিয়োগ মর্যাদা দেয়া যাবে না।

জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ব্রাহ্মণব্রুবঃ ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন ।। (৮/২০)

বঙ্গানুবাদ: বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাব হলে রাজা জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ জাতিসর্বস্ব ব্রাহ্মণকে অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণব্রুবকেও (অর্থাৎ নামে মাত্র ব্রাহ্মণকেও) নিজের ধর্মপ্রবক্তার পদে (শাস্ত্রীয় আইন বিশ্লেষক) নিযুক্ত করবেন, কিন্তু শূদ্র যদি সর্বগুণসম্পন্ন, ধার্মিক এবং ব্যবহারজ্ঞও হয়, তবুও তাকে ঐ পদে নিয়োগ করতে পারবেন না।

শাস্ত্র বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ব্রাহ্মণকেই ধর্মপ্রবক্তা করার বিধান থাকায় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকেই ঐ কাজে নিযুক্ত করতে হয়। কাজেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্য তিন বর্ণের লোককে ধর্ম নিরূপণের কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। তবুও এখানে শূদ্রকে ঐ কাজে নিয়োগ করতে নিষেধ করার তাৎপর্য হলো, ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ পাওয়া না গেলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে ঐ কাজে হয়তো নিয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই শূদ্রকে নয়। এই ব্রহ্মবিধি ভঙ্গ হলে কী পরিণতি হবে তাও মনুশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ।। (৮/২১)

বঙ্গানুবাদ: বিচারসভায় যে রাজার সাক্ষাতে শূদ্র ন্যায়-অন্যায় ধর্ম বিচার করে, সেই রাজার রাজ্য কাদায় নিমগ্ন গোরুর মতো দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে যায়।

যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্।। (৮/২২)

বঙ্গানুবাদ: যে রাজ্য ধর্মাধিকরণে (বিবাদ নিরূপণের ব্যাপারে-) শূদ্রের প্রাধান্য ও নাস্তিকদের প্রভুত্ব, এবং যেখানে দ্বিজগণের (ব্রাহ্মণদের) অভাব, সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও নানারকম রোগে পীড়িত হয়ে অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

অপরাধ সংঘটন হলে রাজার বিচারে দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনুসংহিতার ৮/৩৭৯ সংখ্যক শ্লোক অনুযায়ী শাস্ত্রের বিধান হলো- প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধেও ব্রাহ্মণের এই দণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদনাদি করা যাবে না। যদিও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে বধাদি প্রাণদণ্ডই বিধেয়। এছাড়া মনুশাস্ত্রে আরো বলা হচ্ছে-

ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্।। (৮/৩৮০)

বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ যে কোনও পাপ বা অপরাধই করুক না কেন (যত কিছু অপরাধ আছে সে সবগুলি একসাথে অনুষ্ঠান করলেও) রাজা তাকে হত্যা করবেন না; পরন্তু সমস্ত ধনের সাথে অক্ষত শরীরে তাকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করবেন।

কারণ-

ন ব্রাহ্মণবধাদ্ ভূয়ানধর্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।। (৮/৩৮১)

বঙ্গানুবাদ: এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণবধের তুলনায় গুরুতর অধর্ম (অর্থাৎ পাপ) আর কিছুই নেই। এই কারণে ব্রাহ্মণকে বধ (এবং অঙ্গচ্ছেদনাদি) করার কথা রাজা কখনও মনে মনেও চিন্তা করবেন না।

মনুষ্য সমাজে সন্তান জন্ম নিলে তার একক পরিচিতির জন্যে একটি নামের প্রয়োজন হয়। অবশ্য পালনীয় বৈদিক বিধি মনুসংহিতায় তা অস্বীকার করা হয়নি। তবে বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড় নামকরণ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিয়ে দেয়া হয়েছে সুকৌশলে। বিধি অনুসারে এমনভাবে নামকরণ করতে হবে, নাম থেকেই যেন বুঝা যায় কে উচ্চবর্ণের প্রভুবংশীয় এবং কে নিম্নবর্গীয় দাসজাত শূদ্রবংশীয়।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।। (২/৩১)

বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণের নাম হবে মঙ্গলবাচক শব্দ ('মঙ্গল' শব্দের অর্থ 'ধর্ম'; সেই ধর্মের সাধক 'মঙ্গল্য'; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দ বা ঋষিবাচক শব্দ মঙ্গলের সাধন, তাই 'মঙ্গল্য'; যেমন- ইন্দ্র, বায়ু, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি); ক্ষত্রিয়ের নাম হবে বলসূচক শব্দ (যেমন, প্রজাপাল, দুর্যোধন, নৃসিংহ প্রভৃতি); বৈশ্যের নাম হবে ধনবাচক অর্থাৎ পুষ্টিবৃদ্ধিসমন্বিত (যেমন ধনকর্মা, গোমান, ধনপতি প্রভৃতি) এবং শূদ্রের নাম হবে জুগুপ্সিত (নিন্দা বা হীনতাবোধক, যেমন- কৃপণক, দীন, শবরক ইত্যাদি)।

শর্মবদ্ধাক্ষণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্।। (২/৩২)

বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণের নামের সাথে শর্মা এই উপপদ যুক্ত হবে (অর্থাৎ আগে মঙ্গলবাচক শব্দ তারপর 'শর্মা' এই উপপদ যুক্ত হবে; যেমন শুভশর্মা), ক্ষত্রিয়ের নামের সাথে 'বর্মা' বা এইরকম কোনও রক্ষাবাচক উপাধি যুক্ত হবে; (যেমন বলবর্মা), বৈশ্যের নামের সাথে যুক্ত হবে 'বৃদ্ধ, গুপ্ত, ভূতি' প্রভৃতি পুষ্টিবোধক উপপদ (যেমন গোবৃদ্ধ, ধনগুপ্ত, বসুভূতি প্রভৃতি) এবং শূদ্রের নামের উপাধি হবে প্রৈষ্য (দাস বা ভৃত্য) বাচক শব্দ (যেমন দীনদাস, ব্রাহ্মণদাস, দেবদাস প্রভৃতি)।

আর স্ত্রী-জাতির নামের ক্ষেত্রে ?

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্বাদাভিধানবৎ।। (২/৩৩)

বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোকদের পক্ষে এমন নাম রাখতে হবে- যে নাম সুখে উচ্চারণ করতে পারা যায় অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও বালকেরাও যে নাম অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে (যেমন যশোদাদেবী; এই নাম দুরুশ্চারণাক্ষরহীন হবে, যেমন 'সুশ্লিষ্টাঙ্গী' এই রকম নাম হবে না), সে নাম যেন ক্রূরার্থের প্রকাশক না হয় (অর্থাৎ ডাকিনী, পরুষা প্রভৃতি নাম হবে না), যে নাম বিস্পষ্টার্থ হবে (অর্থাৎ অনায়াসে যে নামের অর্থবোধ হয়; 'কামনিধা', 'কারীষগন্ধী' প্রভৃতি যে সব নামের অর্থ স্পষ্ট নয় এমন নাম হবে না), যে নাম হবে মনোহর অর্থাৎ চিত্তের আহ্লাদজনক (যেমন শ্রেয়সী; কিন্তু 'কালাক্ষী' জাতীয় নাম মনের সুখ উৎপাদন করে না), যে নাম মঙ্গলের বাচক হয় (যেমন চারুমতী, শর্মমতী; বিপরীত নাম যেমন 'অভাগা', 'মন্দভাগ্যা' প্রভৃতি হবে না), যে নামের শেষে দীর্ঘ স্বর থাকে (যেমন 'ঈ'কার, আ-কার যুক্ত নাম), যে নামের উচ্চারণে আশীর্বাদ বোঝায় (যেমন 'সপুত্রা', 'বহুপুত্রা' প্রভৃতি)।

যাই হোক, পুরুষের ভোগ্যসামগ্রি হিসেবে স্ত্রীলোকের একটি সুন্দর নাম যে তাকে ভোগের ক্ষেত্রেও মানসিক পরিতৃপ্তিজনক ক্ষেত্র বা আবহ তৈরি করে, বৈদিক ঈশ্বরের মনেও তা রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হয়। ভাবতে ভালোই লাগে, ঈশ্বর কি তাহলে পুরুষ সম্প্রদায়ের কেউ ? অবশ্য মনুসংহিতায় সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ব্রহ্মা তো পুরুষগুণবাচকই। সেভাবেই তাঁকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাবার আগে এই সংহিতা বা শাস্ত্র রচিত হবার শাস্ত্র-বর্ণিত ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে জেনে রাখলে শাস্ত্রবিধিগুলো অনুধাবনে সহায়তা হতে পারে।

স্বয়ম্ভু ভগবান কর্তৃক পূর্বে অপ্রকাশিত এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি ও সংহারের পর্যায়ক্রমিক বিশদ বর্ণনার এক পর্যায়ে এসে মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে-

এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্বং চরাচরম্।
সঞ্জীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ।। (১/৫৭)
বঙ্গানুবাদ: এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা স্বীয় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সতত সৃষ্টি ও সংহার করছেন।

এরপরই আমরা পেয়ে যাই এই শাস্ত্র প্রস্তুতির উল্লেখ-

ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্।। (১/৫৮)
বঙ্গানুবাদ: ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে আমাকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং আমি (মনু) মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করিয়েছি।

প্রখ্যাত শাস্ত্রভাষ্যকার মেধাতিথি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের এই ৫৮ সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে বলেন- "নারদশ্চ স্মরতি। শতসাহস্রো গ্রন্থঃ প্রজাপতিনা কৃতঃ স মন্বাদিভিঃ ক্রমেণ সংক্ষিপ্ত ইতি।" অর্থাৎ এখানে নারদ বলছেন– "এই গ্রন্থ শতসাহস্র বা লক্ষ সন্দর্ভাত্মক; প্রজাপতি (ব্রহ্মা) এটি রচনা করেছেন। তারপর ঐ লক্ষ সন্দর্ভটিকে ক্রমে ক্রমে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সংক্ষিপ্ত করেছেন।"
এই একই শ্লোকের টিকায় কুল্লুকভট্ট নারদের উক্তি উল্লেখ করে বলেন- ব্রহ্মা প্রথমে স্মৃতিগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন; তারপর মনু নিজ ভাষায় তার সারসংক্ষেপ করেন এবং সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটিই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন।

পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা কল্পনা করে সেই সেই দ্বীপে সাতটি জাতির পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপনের উল্লেখ দেখা যায়। এই সাতটি ছিল মূল জাতি। প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা মনু; ফলে মোট সাতজন মনুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এঁরা হলেন– স্বায়ংভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। এঁদের মধ্যে বৈবস্বত মনুকে আর্যজাতির আদি পিতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় এই মনুর কথাই বলা হয়েছে। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (শ্লোক ৩২-৩৫) দেখা যায়, প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যার দ্বারা মনু-কে সৃষ্টি করেছিলেন। মনু আবার প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে ক্লেশকর তপস্যা করে যে দশজন প্রজাপতি (এঁরা সকলেই মহর্ষি) সৃষ্টি করলেন তাঁরা হলেন– মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক ৫৮-৫৯ অনুযায়ী বলা হচ্ছে, ব্রহ্মা মনুসংহিতায় আলোচনীয় শাস্ত্র অর্থাৎ বিধিনিষেধসমূহ প্রস্তুত করে প্রথমে মনু-কে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং তারপর মনু তা মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়িয়েছিলেন। ভৃগুমনি এই সম্পূর্ণশাস্ত্র মনুর কাছে অধ্যয়ন করলেন। চারটি বর্ণের ও সঙ্কর জাতিগণের

ধর্মসমূহ জানার উদ্দেশ্যে মনু-সমীপে আগত মহর্ষিদের মনু জানালেন যে, তিনি এইসব শাস্ত্র ভৃগুকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এই ভৃগুই ঐ শাস্ত্র আদ্যোপান্ত সকলকে শোনাবেন। মনুকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে মহর্ষি ভৃগু খুশি হয়ে সকল ঋষিকে তাঁদের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিতে লাগলেন– এভাবেই মনুসংহিতা ভৃগু কর্তৃক সংস্কার ও সংকলিত হয়ে প্রচারিত হলো। এ প্রসঙ্গে মনুসংহিতার সর্বশেষ অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকটি লক্ষ্যণীয়–

ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্ নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্ গতিম্।। (১২/১২৬)
বঙ্গানুবাদ: ভৃগুর দ্বারা কথিত এই মনু-সৃষ্ট-শাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করতে থাকলে দ্বিজগণ সতত আচারনিষ্ঠ হন এবং যথাভিলষিত উৎকৃষ্ট গতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করেন।

কিন্তু এ মুহূর্তে স্বর্গ লাভের বদলে আমাদের প্রয়োজন মনুসংহিতা গ্রন্থটি অলৌকিকতার মোড়কে লৌকিক বর্ণাশ্রমপ্রসূত কী ভয়ানক জাতি-বিভেদ ও বর্ণ-বিদ্বেষে দুষ্ট তা অনুধাবন করা। তাই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফিরে আসাই উত্তম।

০৩

মনুসংহিতায় নারীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে তা মনুর শ্লোক থেকেই ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়-

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্।। (৯/৩৩)
বঙ্গানুবাদ: নারী শস্যক্ষেত্রের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি।

বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা।। (৯/৩৫)
বঙ্গানুবাদ: বীজ ও যোনি এই দুটির মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। কারণ, সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকে।

শাস্ত্রীয় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত মনুশাস্ত্রে শস্যক্ষেত্ররূপী নারীর চেয়ে বীজরূপ পুরুষেরই শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে তা কি আর বলতে হয়! তবে পবিত্র শাস্ত্র এটা প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি। নারী যে একটা নিকৃষ্ট কামজ সত্তা তা প্রমাণেও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে-

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ্ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।। (২/২১৩)
বঙ্গানুবাদ: ইহলোকে (শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা মোহিত করে) পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকসম্বন্ধে কখনোই অনবধান হন না।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা না বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।। (২/২১৫)

বঙ্গানুবাদ: মাতা, ভগিনী বা কন্যার সাথে কোনও পুরুষ নির্জন গৃহাদিতে বাস করবে না, কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান্ (চঞ্চল) যে, এরা (শাস্ত্রালোচনার দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করতে পেরেছেন এমন) বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে (অর্থাৎ কামক্রোধাদির বশবর্তী করে তোলে)।

অর্থাৎ তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও আসলে পুরুষ অভব্যই হয়, এবং তার দুরাচারকে সুকৌশলে ব্রহ্মবাক্য দিয়ে শেষপর্যন্ত নারীর উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নারী যে আসলে মানুষ নয়, অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর মতোই পুরুষের ব্যবহারযোগ্য উপভোগের সামগ্রী মাত্র তা নিচের শ্লোক থেকে বুঝতে কি কোন সমস্যা হয় ?

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ।। (২/২৪০)
বঙ্গানুবাদ: স্ত্রী, রত্ন (মণি-মাণিক্য), বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, হিতবাক্য এবং বিবিধ শিল্পকার্য সকলের কাছ থেকে সকলেই গ্রহণ করতে পারে।

মনুশাস্ত্রে আসলে নারীর স্বাধীনতা কখনোই স্বীকার করা হয়নি-

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষবপি।। (৫/১৪৭)
বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোক বালিকাই হোক, যুবতীই হোক কিংবা বৃদ্ধাই হোক, সে গৃহমধ্যে থেকে কোনও কাজই স্বামী প্রভৃতির অনুমতি ছাড়া করতে পারবে না।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।। (৫/১৪৮)
বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনকালে পাণিগ্রহীতার অর্থাৎ স্বামীর অধীনে থাকবে এবং স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রদের অধীনে থাকবে। (পুত্র না থাকলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বামীর সপিণ্ড না থাকলে পিতার সপিণ্ড এবং পিতার সপিণ্ড না থাকলে রাজার বশে থাকবে), কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, সপিণ্ড মানে যিনি মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিণ্ড দানের যোগ্য। হিন্দুশাস্ত্রে পিণ্ডদানের ক্রমাধিকারের সাথে সম্পত্তির অধিকার অর্জনের বিষয়ও জড়িত।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে।। (৫/১৪৯)
বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোক কখনো পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ, স্ত্রীলোক এদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে পিতৃকুল ও পতিকুল– উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে তোলে।

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ র্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।। (৫/১৫৪)

বঙ্গানুবাদ: স্বামী বিশীল (অর্থাৎ জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্ত এবং সদাচারশূন্য), কামবৃত্ত (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত) এবং শাস্ত্রাধ্যায়নাদি ও ধনদানাদি গুণবিহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হল স্বামীকে দেবতার মতো সেবা করা।

কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।। (৫/১৫৭)
বঙ্গানুবাদ: পতি মৃত হলে স্ত্রী বরং পবিত্র ফুল-ফল-মূলাদি অল্পাহারের দ্বারা জীবন ক্ষয় করবে, কিন্তু ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণও করবে না।

অর্থাৎ নারীর কোন জৈবিক চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে না। এই চাওয়া-পাওয়াকে পবিত্র মনুশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়নি। তবে নারীর ক্ষেত্রে জৈবনিক চাহিদাকে স্বীকার করা না হলেও শাস্ত্রে পুরুষের কামচরিতার্থতার প্রয়োজনকে কিন্তু অস্বীকার করা হয়নি, বরং তা পূরণের জন্য পবিত্র বিধানও তৈরি করে দেয়া হয়েছে-

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ।। (৫/১৬৮)
বঙ্গানুবাদ: (সুশীলা–) ভার্যা স্বামীর পূর্বে মারা গেলে তার দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ ও অগ্ন্যাধ্যান করবে (যদি ধর্মানুষ্ঠান ও কামচরিতার্থতার প্রয়োজন থাকে, তবেই ঐ স্বামীর পুনরায় দারপরিগ্রহ করা উচিৎ। তা না হলে পত্নী নেই বলে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে)।

যারা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে নারী-পুরুষের সমতা খুঁজে বেড়ান, তারা আসলে কী যে খুঁজেন বুঝা দায়। তবে মনুশাস্ত্রে স্ত্রীর মর্যাদা কতটুকু তা এই শ্লোক থেকেও কিঞ্চিত অনুধাবন করা যেতে পারে-

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যূ রজ্জ্বা বেণুলেন বা।। (৮/২৯৯)
বঙ্গানুবাদ: স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদরভ্রাতা অপরাধ করলে সূক্ষ্ম দড়ির দ্বারা কিংবা বেতের দ্বারা শাসনের জন্য প্রহার করবে।

তবে প্রিয়জনকে প্রহার বলে কথা, তাই শাস্ত্র কি এতোটা নির্দয় হতে পারে ! প্রহারের নিয়মও বলে দেয়া হয়েছে-

পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোহন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্।। (৮/৩০০)
বঙ্গানুবাদ: রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা প্রহার যদি করতে হয়, তাহলে শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগে প্রহার কর্তব্য; কখনো উত্তমাঙ্গে বা মাথায় যেন প্রহার করা না হয়; এই ব্যবস্থার অন্যথা করে অন্যত্র প্রহার করলে প্রহারকারী চোরের মতো অপরাধী ও দণ্ডনীয় হবে।

তারপরও এসব হচ্ছে শাস্ত্রবাক্য। আর শাস্ত্র কি উচিত কথা বলতে কার্পণ্য করতে পারে ? তাই বলা হচ্ছে-

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম্।। (৮/৪১৬)

বঙ্গানুবাদ: স্মৃতিকারদের মতে ভার্যা, পুত্র ও দাস– এরা তিনজনই অধম (বিকল্পে অধন); এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে তাতে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে।

দাসী হোক বাঁদী হোক, তবু তো স্ত্রী, তাকে ছাড়া পুরুষের চলেও না। তাই মনুসংহিতায় পুরুষদেরকে স্ত্রী-স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞাত করা না হলে কি চলে !

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।। (৯/১৭)

বঙ্গানুবাদ: বেশি নিদ্রা যাওয়া, কেবল বসে থাকার ইচ্ছা, শরীরকে অলংকৃত করা, কাম অর্থাৎ পুরুষকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, নীচহৃদয়তা, অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কুচর্মা অর্থাৎ নীচ পুরুষকে ভজনা করা– স্ত্রীলোকদের এই সব স্বভাব মনু এদের সৃষ্টি-কালেই করে গিয়েছেন।

এরকম অদ্ভুত বক্তব্য মনুশাস্ত্রে নিতান্ত কম নয়। তাই বোধ করি শাস্ত্র অত্যন্ত সচেতনভাবেই স্ত্রী-রক্ষকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে-

ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্যাং ভর্তারো দুর্বলা অপি।। (৯/৬)

বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোককে রক্ষণরূপ-ধর্ম সকল বর্ণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম– অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই ব্যাপার বুঝে অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি দুর্বল স্বামীরাও নিজ নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করবার জন্য যত্ন করবে।

প্রশ্ন হতে পারে, স্ত্রী-রক্ষায় এতোটা গুরুত্ব দেয়া হলো কেন ? কারণ-

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।। (৯/৭)

বঙ্গানুবাদ: যে লোক যত্নের সাথে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করে, তার দ্বারা নিজ সন্তান রক্ষিত হয়। কারণ, সাঙ্কর্যাদি দোষ না থাকলে বিশুদ্ধ সন্তান-সন্ততি জন্মে। স্ত্রীকে রক্ষার দ্বারা শিষ্টাচার রক্ষিত হয় এবং নিজের কুলমর্যাদা রক্ষিত হয়। স্ত্রীকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয় এবং স্ত্রীকে রক্ষা করলে স্বামী তার নিজের ধর্মকেও রক্ষা করতে পারে।

তাই, কিভাবে স্ত্রীকে রক্ষা করতে হবে তার উপায়ও মনু বাতলে দিয়েছেন-

ন কশ্চিদ্‌যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্।। (৯/১০)

বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোকসমূহকে কেউ বলপূর্বক বা সংরোধ বা তাড়নাদির দ্বারা রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু বক্ষ্যমাণ উপায়গুলি অবলম্বন করলে তাদের রক্ষা করা যায়।

কী উপায় ?

অর্থস্য সংগ্রেহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্মেহন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে।। (৯/১১)

বঙ্গানুবাদ: টাকাকড়ি ঠিকমত হিসাব করে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালী শুদ্ধ রাখা, ধর্ম-কর্ম সমূহের আয়োজন করা, অন্নপাক করা এবং শয্যাসনাদির তত্ত্বাবধান করা– এই সব কাজে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করে অন্যমনস্ক রাখবে।

মূলত মনুশাস্ত্রে কোথাও নারীকে শূদ্রের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্মৃতি বা বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে বা কোন ধর্মানুষ্ঠানে শূদ্রকে যেমন কোন অধিকার দেয়া হয়নি, নারীকেও তেমনি স্বভাবজাত দাসী বানিয়েই রাখা হয়েছে-

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।। (৯/১৮)

বঙ্গানুবাদ: স্ত্রীলোকদের মন্ত্রপাঠপূর্বক জাতকর্মাদি কোনও ক্রিয়া করার অধিকার নেই– এ-ই হলো ধর্মব্যবস্থা। অর্থাৎ স্মৃতি বা বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে এবং কোনও মন্ত্রেও এদের অধিকার নেই– এজন্য এরা মিথ্যা বা অপদার্থ, – এই হলো শাস্ত্রস্থিতি।

০৪

সম্পদ অর্জন এবং তা নিজের অধিকারে রাখার প্রচেষ্টা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এককালে ব্যক্তির উত্তরাধিকার তৈরি জরুরি হয়ে পড়ে। এবং এ কারণেই মানব সমাজে বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হয় বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত। বৈদিক সমাজে বিবাহকে অন্যতম ধর্মানুষ্টানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও বৈষম্যবাদী বর্ণপ্রথার তীব্র উপস্থিতি। বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় শূদ্রনারীকে উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা ভোগ করার ব্যবস্থা পাকা করা হলেও শূদ্রদের জন্য কোন মর্যাদা বা সুযোগ না রেখে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করার কূটকৌশলী প্রয়াস মনুসংহিতার বিবাহ ব্যবস্থায় তীব্রভাবে লক্ষ্যণীয়।

সবর্ণাহগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।। (৩/১২)

বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- এই দ্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহব্যাপারে সর্বপ্রথমে (অর্থাৎ অন্য নারীকে বিবাহ করার আগে) সমানজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু কামনাপরায়ণ হয়ে পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্ত হলে (অর্থাৎ সবর্ণাকে বিবাহ করা হয়ে গেলে তার উপর যদি কোনও কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের উৎপাদনের জন্য ব্যাপার নিষ্পন্ন না হলে যদি কাম-প্রযুক্ত অন্যস্ত্রী-অভিলাষ জন্মায় তাহলে) দ্বিজাতির পক্ষে বক্ষ্যমাণ নারীরা প্রশস্ত হবে। (পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণিত হয়েছে)

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।। (৩/১৩)

বঙ্গানুবাদ: একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্যা হবে; বৈশ্য সজাতীয়া বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করতে পারে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে সবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে।

অর্থাৎ এখানে 'অনুলোম' বিবাহের বিষয়টিকেই অনুমোদন করা হয়েছে। উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলে। এর বিপরীত বিবাহের নাম প্রতিলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ সকল স্মৃতিকারদের দ্বারাই নিন্দিত। মনু মনে করেন, প্রথমে সজাতীয়া কন্যার সাথে বিবাহই প্রশস্ত। পুনর্বিবাহের ইচ্ছা হলে অনুলোম-বিবাহের সমর্থন দেয়া হয়েছে।
কিন্তু এখানেও অন্য ভার্যায় সমস্যা নেই, শূদ্রা ভার্যার ক্ষেত্রেই যত বিপত্তি।

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি।। (৩/১৮)
বঙ্গানুবাদ: শূদ্রা ভার্যা গ্রহণের পর যদি ব্রাহ্মণের দৈবকর্ম (দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বা যে ব্রাহ্মণভোজনাদি হয়, তা), পিত্র্যকর্ম (পিতৃপুরুষের প্রতি করণীয় কর্ম যেমন শ্রাদ্ধ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি) এবং আতিথেয় কর্ম (যেমন অতিথির পরিচর্যা, অতিথিকে ভোজন দান প্রভৃতি) প্রভৃতিতে শূদ্রা ভার্যার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ঐ কর্মগুলি যদি শূদ্রা স্ত্রীকর্তৃক বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহলে সেই দ্রব্য পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ঐ সব দেবকর্মাদির ফলে স্বর্গেও যান না (অর্থাৎ সেই সব কর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়)।

অর্থাৎ শূদ্রা নারী ব্রাহ্মণের প্রথম পরবর্তী ভার্যা হয়ে ব্রহ্মভোগের বস্তু হলো ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর কোনো মর্যাদাই তার প্রাপ্য হয় না। আর যদি সে প্রথম বিয়ে করা স্ত্রী হয় ?

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।। (৩/১৭)
বঙ্গানুবাদ: সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ করে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন (অর্থাৎ সমানজাতীয়া নারী বিবাহ না করে দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করলেও তাতে সন্তান উৎপাদন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়)।

এছাড়া ব্যভিচারের দণ্ডের ক্ষেত্রেও বৈষম্যবাদী বর্ণপ্রথা চোখে পড়ার মতো-

শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে।। (৮/৩৭৪)
বঙ্গানুবাদ: কোনও দ্বিজাতি-নারী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারী) স্বামীর দ্বারা রক্ষিত হোক্ বা না-ই হোক্, কোনও শূদ্র যদি তার সাথে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহলে অরক্ষিতা নারীর সাথে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্ব হরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে, আর যদি স্বামীর দ্বারা রক্ষিতা নারীর সাথে সম্ভোগ করে তাহলে ঐ শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মারণদণ্ড হবে।

অথচ উচ্চবর্ণিয়দের ক্ষেত্রে একই অপরাধের জন্য বিবিধ বিধানের মাধ্যমে মনুশাস্ত্রে বর্ণক্রমানুসারে বিভিন্ন মাত্রার কিছু অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে মাত্র।

০৫

বৈদিক শাস্ত্র মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে যে, ব্রহ্মা তাঁর পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ শূদ্রের জন্ম নিজে নিজে বা তার ইচ্ছায় হয়নি বা এ প্রক্রিয়ায় তার কোন কর্মদোষও জড়িত নেই। জড়িত কেবল স্রষ্টা

ব্রহ্মার তীব্র বৈষম্যমূলক দৃষ্টি। অথচ মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি অন্য বর্ণকে যে অমানবিক আচরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা এককথায় ন্যাক্কারজনক।

> ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতম্।
> ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।। (৪/৮০)
> বঙ্গানুবাদ: শূদ্রকে কোন মন্ত্রণা-পরামর্শ দেবে না। শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান করবে না। যজ্ঞের হবির জন্য যা 'কৃত' অর্থাৎ সঙ্কল্পিত এমন দ্রব্য শূদ্রকে দেবে না; শূদ্রকে কোনও ধর্মোপদেশ করবে না এবং কোনও ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত করতেও উপদেশ দেবে না।
>
> কেউ এ বিধান অমান্য করলে তার পরিণতি বর্ণিত হয়েছে এভাবে-
> যো হ্যস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
> সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি।। (৪/৮১)
> বঙ্গানুবাদ: যে ব্যক্তি (কোন ব্রাহ্মণকে ব্যবধানে না রেখে) নিজে শূদ্রকে ধর্মোপদেশ দেন, বা প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করতে আদেশ দেন, তিনি সেই শূদ্রের সাথে অসংবৃত নামক গহন নরকে নিমগ্ন হন।

উল্লেখ্য যে, মনুশাস্ত্রে শূদ্রে কোনরূপ সম্পদ অর্জনকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

> শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
> শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।। (১০/১২৯)
> বঙ্গানুবাদ: 'ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না, কেননা ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না করে অবমাননা করতে পারে।'

এই যখন অবস্থা– সম্পদ অর্জন নয়, কোনরূপ খাবার সরবরাহও নয়, তাহলে শূদ্রদের বেঁচে থাকার উপায় ? উপায় একটা রয়েছে বৈ কি। এক্ষেত্রে যেসব জন্মদাস শূদ্র ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চবর্ণীয়দের সেবা শুশ্রূষায় কৃতপরায়ণ হবে তাদের প্রতি অবশ্য কিছুটা করুণা দেখানো হয়েছে। যেমন-

> শূদ্রাণাং মাসিকং কার্যং বপনং ন্যায়বর্তিনাম্।
> বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্।। (৫/১৪০)
> বঙ্গানুবাদ: ন্যায়চরণকারী শূদ্রগণ (অর্থাৎ সে সব শূদ্র ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষা পরায়ণ) মাসে মাসে কেশ বপন (অর্থাৎ কেশমুণ্ডন) করবে এবং জননশৌচে ও মরণাশৌচে বৈশ্যের মত অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে।
>
> উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
> পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ।। (১০/১২৫)
> বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ-পরিত্যক্ত বস্ত্র, ধানের পুলাক অর্থাৎ আগড়া (অসার ধান) এবং জীর্ণ পুরাতন 'পরিচ্ছদ' অর্থাৎ শয্যা-আসন প্রভৃতি আশ্রিত শূদ্রকে দেবেন।

মনুসংহিতায় বর্ণিত সামাজিক বিচার ব্যবস্থায় দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বর্ণবৈষম্যের তীব্রতা লক্ষ করা যায়। অধমর্ণদের প্রতি উত্তমর্ণের খারাপ আচরণের দণ্ডের সাথে উত্তমর্ণের প্রতি অধমণের্র খারাপ আচরণের দণ্ডে যথেষ্ট ভেদ রয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্ণ শূদ্র ও অন্ত্যজদের প্রতি দণ্ড প্রয়োগের বিধি একেবারেই অমানবিকতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়।

পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশৎ শূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।। (৮/২৬৮)

বঙ্গানুবাদ: (উত্তমর্ণ) ব্রাহ্মণ যদি (অধমর্ণ অনুসারে) ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশন বা গালিগালাজ করে তা হলে তার পঞ্চাশ দণ্ড হবে, বৈশ্যের প্রতি করলে পঁচিশ পণ এবং শূদ্রের প্রতি করলে বারো পণ দণ্ড হবে।

শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোহ প্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি।। (৮/২৬৭)

বঙ্গানুবাদ: ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে গালাগালি দেয় তা হলে তার এক শ পণ দণ্ড হবে। এই একই অপরাধে বৈশ্যের দণ্ড হবে দেড় শ কিংবা দুই শ পণ; আর শূদ্র শারীরিক দণ্ড প্রাপ্ত হবে (এই দণ্ড অপরাধের তীব্রতা অনুযায়ী বধ পর্যন্ত হতে পারে)।

এই শারীরিক দণ্ড কেমন হবে তাও বিশদ ব্যাখ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে-

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেৎ শ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্।। (৮/২৭৯)

বঙ্গানুবাদ: শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ ব্যক্তি (শূদ্র থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি) দ্বিজাতিগণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যে অঙ্গের দ্বারা পীড়ন করবে তার সেই অঙ্গ ছেদন করে দেবে, এটি মনুর নির্দেশ।

মনুশাস্ত্র অনুযায়ী-

একজাতি শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- এইসব দ্বিজাতিকে দারুণ কথা বলে গালি দেয় তা হলে তার জিহ্বাছেদন কর্তব্য (৮/২৭০), যদি নাম ও জাতি তুলে আক্রোশন করে তবে তার মুখের মধ্যে দশ-আঙুল পরিমাণ জ্বলন্ত লৌহময় কীলক প্রবেশ করিয়ে দেবে (৮/২৭১), যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রাহ্মণকে "তোমার এই ধর্ম অনুষ্ঠেয়, এখানে ধর্মানুষ্ঠানে তোমাকে এই সব কাজ করতে হবে" এইসব বলে ধর্মোপদেশ করে তা হলে রাজা তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তেল ঢেলে দেবেন (৮/২৭২), যদি হাত উঁচিয়ে কিংবা লাঠি উঁচিয়ে ক্রোধের সাথে উচ্চ জাতিকে প্রহার করে তবে তার হাত কেটে দেবে এবং পায়ের দ্বারা যদি ক্রোধের সাথে প্রহার করে তা হলে পা কেটে দেবে (৮/২৮০), ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু-গয়ের প্রভৃতি দিলে রাজা অপরাধীর ওষ্ঠদ্বয় কেটে দেবেন, মূত্রাদি ত্যাগ করলে পুরুষাঙ্গ এবং পায়ুবায়ু ত্যাগ করলে মলদ্বার কেটে দেবেন (৮/২৮২)। (অপমান করার অভিপ্রায়ে কোনও শূদ্র যদি ঔদ্ধত্যবশতঃ) ব্রাহ্মণের চুল ধরে টানে, কিংবা পা, দাড়ি, গ্রীবা (গলা) কিংবা বৃষণ (অণ্ডকোষ) ধরে টানে তাহলে রাজা কোন রকম বিচার না করেই ঐ শূদ্রের দুটি হাতই কেটে দেবেন (৮/২৮৩)।

শুধু তা-ই নয়–

ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবরবর্ণজম্।

হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ।। (৯/২৪৮)

বঙ্গানুবাদ: যদি কোনও শূদ্র ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তাহলে অতি কষ্টপ্রদ নানা উদ্বেগজনক-উপায়ে (যেমন শূলে চড়িয়ে, মস্তক ছেদন করে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে) সেই শূদ্রকে বধ করা উচিত ।

তাছাড়া-

সহাসনমভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচং বাহস্যাবকর্তয়েৎ ।। (৮/২৮১)

বঙ্গানুবাদ: যদি কোন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই আসনে বসে তা হলে তার কোমরে ছেঁকা লাগিয়ে দাগ দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে কিংবা তার পাছা খানিকটা কেটে দেবে ।

শূদ্রজন্ম যে প্রকৃত অর্থেই দাসজন্ম, এ বিষয়টা যাতে কারো কাছে অস্পষ্ট না থাকে সেজন্যে মনুশাস্ত্রে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে-

শূদ্রং তু কারয়েদ্ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা ।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ।। (৮/৪১৩)

বঙ্গানুবাদ: ক্রীত অর্থাৎ অন্নাদির দ্বারা প্রতিপালিত হোক্ বা অক্রীতই হোক্ শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ দাসত্বের কাজ করিয়ে নেবেন । যেহেতু, বিধাতা শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন ।

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে ।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি ।। (৮/৪১৪)

বঙ্গানুবাদ: প্রভু শূদ্রকে দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেও শূদ্র দাসত্ব কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না । দাসত্বকর্ম তার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ জন্মের সাথে আগত) । তাই ঐ শূদ্রের কাছ থেকে কে দাসত্ব কর্ম সরিয়ে নিতে পারে ?

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্মাণি কারয়েৎ ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ ।। (৮/৪১৮)

বঙ্গানুবাদ: রাজা বিশেষ যত্ন সহকারে বৈশ্য এবং শূদ্রকে দিয়ে তাদের কাজ অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়ে নেবেন । কারণ, তারা নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করলে এই পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে ।

অর্থাৎ শূদ্রকে তার নিজ কর্মের বাইরে বিকল্প জীবিকা গ্রহণের কোন সুযোগও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । অথচ উচ্চবর্ণিয়দের জন্য প্রতিকুল সময়ে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ এই মনুসংহিতায় বিশদভাবেই দেয়া হয়েছে ।

০৬

ব্রাহ্মণদের প্রভূত্বকামী শাসনব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রধান অস্ত্রই হলো চতুবর্ণ প্রথা । অর্থাৎ সমাজে চারটি বর্ণের উপস্থিতি– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র । এই প্রথার মাধ্যমে গোটা জনগোষ্ঠিকে এক অদ্ভুত বর্ণবৈষম্যের মধ্য দিয়ে বিভাজিত করে যে 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি কায়েম করা হয়েছে, সেখানে স্বঘোষিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রশ্নহীন করে রাখা হয়েছে । বর্ণ-মর্যাদার দিক থেকে এর পরই

রাজদণ্ডধারী ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। তার নিচে বৈশ্য এবং সর্বনিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্র। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সেখানে কোন মানুষের উল্লেখ নাই বললেই চলে। অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কিত ধারণা বা মানব সমাজটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগ্রাসনবাদী বৈদিক সমাজের সর্বগ্রাসী বর্ণ-বিভেদের ছায়ায়। গোটা মনুসংহিতার কোথাও কোন ভাবে মানুষ নামের কোন স্বতন্ত্র সত্তার বা মানব জাতির অস্তিত্ব প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে– চারটি বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্য জাতি ও শূদ্র জাতি। তবে চতুর্বর্ণের বাইরে আরেকটি গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে– অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য। অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকলেও সমাজ যাকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে না।

যেহেতু চারটি বর্ণ নিয়ে সমাজ, তাই এই অস্পৃশ্যরা বর্ণ-বিভাগেরও বাইরে। মনুসংহিতায় এদেরকে 'সঙ্করজাতি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে এরা কি এই বৈদিক সমাজ বা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় ? একটা অস্পষ্ট বিভ্রান্তি থেকে যায়-

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।। (১০/৪)

বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের বিধান থাকায় এরা 'দ্বিজাতি' নামে অভিহিত হয়। আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উপনয়নসংস্কার বিহীন হওয়ায় দ্বিজাতি নয়, তারা হলো 'একজাতি'। এছাড়া পঞ্চম কোনও বর্ণ নেই অর্থাৎ ঐ চারটি বর্ণের অতিরিক্ত যারা আছে তারা সকলেই সঙ্করজাতি।

প্রাসঙ্গিকভাবেই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত চারজাতীয় মানুষই হলো চারটি বর্ণ। এ ছাড়া বর্বর, কৈবর্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে সব মানুষ আছে তারা সঙ্কীর্ণযোনি বা বর্ণসঙ্কর। চারটি বর্ণের মধ্যে তিনটি বর্ণ 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ এদের দুবার জন্ম হয়; কারণ দ্বিতীয়-জন্ম উৎপাদক উপনয়ন-সংস্কার কেবল ঐ তিনটি বর্ণের পক্ষেই শাস্ত্রমধ্যে বিহিত আছে। শূদ্র হলো একজাতি অর্থাৎ ওদের একবার মাত্র জাতি বা জন্ম হয়, কারণ শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নেই। অতএব অনিবার্যভাবে শূদ্ররা হলো নিম্নবর্ণ। ফলে এরা ব্রত যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি পালনের যোগ্য হতে পারে না।

এবার বর্ণসঙ্কর বিষয়ে মনুর বৈদিক অভিজ্ঞানশ্রুতি থেকে কিঞ্চিৎ ধারণা নিতে পারি।

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।। (১০/৫)

বঙ্গানুবাদ: সকল বর্ণের পক্ষেই স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি (অর্থাৎ প্রথমবিবাহিতা এবং যার সাথে আগে কোনও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক হয় নি) সবর্ণ বা সমান জাতির নারীর গর্ভে সবর্ণ পতিকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান পিতামাতার জাতি থেকে অভিন্ন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান 'ব্রাহ্মণ'হবে; ক্ষত্রিয়কর্তৃক এই রকম ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'ক্ষত্রিয়' হবে; বৈশ্যকর্তৃক স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি বৈশ্যার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'বৈশ্য' এবং শূদ্রকর্তৃক ঐ রকম শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'শূদ্র' হবে। এসব ছাড়া অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান জনকের সাথে সবর্ণ হয় না, নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হবে।

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।। (১০/৬)

বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজ বর্ণ-ত্রয়ের দ্বারা অনুলোমক্রমে অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী জাতীয়া নারীর গর্ভে জাত সন্তানেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন সন্তান এবং ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যানারীতে উৎপন্ন সন্তান এবং বৈশ্যকর্তৃক শূদ্রা নারীতে উৎপন্ন সন্তানগণ হীনজাতীয়া মাতার গর্ভে উৎপন্ন বলে পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু উৎপাদকের (পিতার) জাতির সদৃশ হয়। এই সন্তানেরাই মূর্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ নামে অভিহিত হয়। এরা মাতৃজাতির তুলনায় উৎকৃষ্ট কিন্তু পিতৃজাতির তুলনায় নিকৃষ্ট।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ।। (১০/১০)
বঙ্গানুবাদ: ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনটি বর্ণের নারীতে (অর্থাৎ পরিণীতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে) উৎপন্ন (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ বা ভৃজ্যকণ্ঠ ও নিষাদ বা পারশব), ক্ষত্রিয় পুরুষের পক্ষে দুইটি বর্ণের নারীতে (অর্থাৎ বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে) জাত (মাহিষ্য ও উগ্র), এবং বৈশ্য পুরুষের পক্ষে একটি বর্ণের নারীতে (অর্থাৎ শূদ্রা স্ত্রীতে) জাত (করণ)- এই ছয় জাতীয় অনুলোমজ সন্তান অপসদ নামে অভিহিত হয় (অপসদ মানে পুত্রের যে প্রয়োজন তা থেকে এরা অপসারিত; সমান জাতীয় পুত্রের তুলনায় এরা অপসদ অর্থাৎ অপকৃষ্ট); এই অনুলোম-সঙ্করজাতির কথা স্মৃতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, শাস্ত্রানুযায়ী পুত্রের প্রয়োজন হয় পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি বা সদগতির লক্ষ্যে (স্বর্গারোহন) শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান করার জন্য। পিণ্ডদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মূলত অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। বৈদিক শাস্ত্রে পুত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় নিম্নোক্ত শ্লোকটি থেকে-

সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্ রিক্থজাতং স্যাত্তত্তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ।। (৯/১৯০)
বঙ্গানুবাদ: কোনও ব্যক্তি যদি অপুত্র অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সগোত্র পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে এবং মৃত ব্যক্তির যা কিছু ধনসম্পত্তি তা ঐ পুত্রকে অর্পণ করবে।

বৈদিক বিধান এমনই অলৌকিক শাস্ত্র যে সম্পদরক্ষায় পুত্রের প্রয়োজনে মনুসংহিতার ৫/১৫৭ সংখ্যক শ্লোকে (ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত) বর্ণিত বিধবার কর্তব্যও সাময়িক রদ হয়ে যায়।

শাস্ত্র অনুযায়ী উপরোক্ত অনুলোমজ (উচ্চবর্ণ পিতার ঔরসে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ মাতার গর্ভজাত) সন্তানেরা সবর্ণ পুত্রের সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও এরা বর্ণবহির্ভূত নয়। এরা মাতৃজাতির তুল্য অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারের যোগ্য হয়। কিন্তু প্রতিলোম-সঙ্করের (নিম্নবর্ণ পিতার ঔরসে অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণ মাতার গর্ভজাত সন্তানের) ক্ষেত্রেই যতসব শাস্ত্রীয় সমস্যা ও জটিলতার সূত্রপাত। এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ মনু একের পর এক প্রতিলোমজ সঙ্করের উৎপত্তি ও পর্যায়ক্রমিক যে বহুবিধ জাতি-তালিকা তৈরি করতে থাকেন, রীতিমতো বিভ্রান্ত হবার মতো। এবং একটা পর্যায়ে এসে হঠাৎ করে আমরা কতকগুলো স্পর্শাদি-অযোগ্য অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য জাতির সন্ধান পেতে থাকি। যেমন প্রাথমিকভাবে সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল নামের যে প্রতিলোমজ-সঙ্কর জাতি পাই, তাদের মধ্যে চণ্ডাল হলো অস্পৃশ্য। তবে আয়োগব ও ক্ষত্তা অস্পৃশ্য না হলেও এরা অপসদ বা নরাধম, অর্থাৎ পুত্রকাজ করার

অযোগ্য। কারণ এরা শূদ্র পিতার ঔরসে প্রতিলোমজ-সঙ্কর। এক্ষেত্রে মনুসংহিতায় সুকৌশলে তৈরি বিধিবদ্ধ সূত্রগুলো কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করে নেয়া যায়-

একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্ত্রবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেহপি জন্মনি।। (১০/১৩)
বঙ্গানুবাদ: একান্তরে অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণের ব্যবধানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণপুরুষের ঔরসে বৈশ্যজাতীয় নারীর গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়পুরুষের ঔরসে শূদ্রানারীর গর্ভে জাত উগ্র– এইসব অনুলোমজ সন্তান যেমন স্পর্শাদিযোগ্য হয়, সেইরকম প্রতিলোমক্রমে একান্তরিত অর্থাৎ একজাতি-ব্যবধানে উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে জাত (যেমন, শূদ্রপুরুষ থেকে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন ক্ষত্তা এবং বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন বৈদেহ) দুই জাতি স্পর্শাদিযোগ্য হবে। (তবে যজনাদিক্রিয়াতে এদের তুল্যতা নেই।)

এই সূত্রানুযায়ী প্রতিলোমজগণের মধ্যে দুই বর্ণ-ব্যবধানে (অর্থাৎ শূদ্র পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে) উৎপন্ন চণ্ডাল এই সূত্রে পড়ে না বলে শাস্ত্রানুযায়ী চণ্ডালই একমাত্র অস্পৃশ্য হয়ে যায়।

এখানে একটা সাধারণ সূত্র খেয়াল রাখতে হবে। চতুর্বর্ণ প্রথার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এরা বর্ণক্রমে দ্বিজজাতি। অর্থাৎ তাদের জন্য উপনয়ন-সংস্কারের বিধান থাকায় এরা উৎকৃষ্ট জাতি। তাই এই তিন বর্ণের নারীতে অনুলোমক্রমে উৎপাদিত সন্তানও দ্বিজ হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া, ক্ষত্রিয়জাতীয়া ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়পুরুষ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীতে এবং বৈশ্যপুরুষ কর্তৃক বৈশ্যনারীতে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হবে। আর বাহ্যক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতিলোমক্রমে অনন্তরবর্তী উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে যেমন বৈশ্যপুরুষ কর্তৃক ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় সেও তাদের আত্মা অর্থাৎ দ্বিজ হয়। এককথায় দ্বিজদের মধ্যে আন্তসম্পর্কক্রমে উৎপাদিত বর্ণসঙ্কররা দ্বিজজাতিই হবে।

কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও শূদ্র নারী বা পুরুষের আবির্ভাব ঘটলে। শাস্ত্রীয় বিধানে দাসজাতি শূদ্রবর্ণের জন্য উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নাই বলে এরা একজাতি। তাই তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্ণসঙ্করাও দ্বিজ হয় না। এক্ষেত্রে অনুলোম প্রক্রিয়ায় শূদ্রা স্ত্রী উচ্চবর্ণভোগ্যা হওয়া তার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার বলে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হয় না বটে, তবে মাতৃজাতি শূদ্র থেকে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু শূদ্রবর্ণের পুরুষের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ প্রতিলোম প্রক্রিয়ায় উচ্চবর্ণের স্ত্রীভোগ গুরুতর সামাজিক অপরাধ বা দূষণ হিসেবেই চিহ্নিত। তাই এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বর্ণসঙ্কর সন্তান তাদের পুত্র-অধিকার হারিয়ে নরাধম হয়ে যায়। আর এই অপরাধের মাত্রা বা দূষণপ্রক্রিয়া তীব্রতম হলে অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণা স্ত্রী দূষিত হলে উৎপাদিত বর্ণসঙ্কর অস্পৃশ্য চণ্ডাল হয়ে যায়।

অতএব, শূদ্র পুরুষ যেখানে বর্ণসঙ্করে জড়িত সেখানে কি সমস্যা না হয়ে পারে ?

আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ।। (১০/১৬)
বঙ্গানুবাদ: শূদ্র পুরুষ থেকে প্রতিলোমক্রমে জাত অর্থাৎ শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত চণ্ডাল– এই

তিন জাতি পুত্রকাজ করার অযোগ্য। এই জন্য এরা অপসদ অর্থাৎ নরাধম বলে পরিগণিত হয়। এদের মধ্যে চণ্ডাল হলো অস্পৃশ্য।

চণ্ডালশ্বপচানাং তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দভম্।। (১০/৫১)
বঙ্গানুবাদ: চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। এইসব জাতিকে 'অপপাত্র' করে দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হবে তাদের ধনস্বরূপ। (অপপাত্র হলো যে পাত্রে ভোজন করলে তা আর সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করা চলবে না, তা পরিত্যাগই করতে হবে। অথবা তারা যে পাত্র স্পর্শ করে থাকবে তাতে অন্ন-শক্তু প্রভৃতি দেয়া চলবে না; কিন্তু পাত্রটি মাটির উপর রেখে দিলে কিংবা অন্য কোনও লোক তা হাতে করে ধরে থাকলে তার উপর ভাত-ছাতু প্রভৃতি দিয়ে মাটির উপর রেখে দিলে তারা ঐ খাদ্য গ্রহণ করবে। অন্য অর্থে ভাঙা পাত্রকে অপপাত্র বলে।)

বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ।। (১০/৫২)
বঙ্গানুবাদ: মৃত লোকের কাপড় এদের আচ্ছাদন (পোষাক) হবে; এরা ভাঙা পাত্রে ভোজন করবে; এদের অলঙ্কার হবে লৌহনির্মিত; এবং এরা সকল সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াবে। অর্থাৎ একই স্থানে বাস করবে না।

খুব সাধারণভাবে সঙ্কর জাতি থেকে সঙ্কর জাতিরই জন্ম হয়। আর শাস্ত্রানুযায়ী জন্মদোষ যেহেতু প্রজন্মক্রমেই স্থায়ী দোষ, যা থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই, তাই যেখানে নরাধম ও অস্পৃশ্যের ছোঁয়া পড়ে সেখানে পরবর্তী বংশ পরম্পরায় অস্পৃশ্য-সঙ্কর জাতিরই উৎপত্তি হতে থাকে। এভাবে ডাল-পালা বিস্তৃত করতে করতে সর্বজ্ঞ মনু তাঁর শঙ্করায়ন-শাস্ত্রকে এতোটাই জটিল পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে শেষপর্যন্ত শত শত অন্ত্যজ-অছ্যুৎ সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠির বিশাল এক জনগোষ্ঠিই সেখানে বাঁধা পড়ে যায়, যারা মূলত শ্রমজীবী। সমাজের গতিচক্রটিকে এরাই ধারণ করে অথচ এরাই হয়ে যায় বৈদিক সমাজের ব্রাত্য জনগোষ্টি– অছ্যুৎ, অস্পৃশ্য, দলিত বা নির্যাতিতও। মনুসংহিতায় এই ব্রাত্যজনগোষ্ঠির উৎপত্তি নির্ধারণক্রমে সৃষ্ট যে জালিকাবিন্যাস, এর সুদীর্ঘ তালিকা দেখলে রীতিমতো আঁৎকে ওঠতে হয় ! প্রাসঙ্গিক হিসেবে দুয়েকটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য, যেমন-

যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতু র্বর্ণ্যে প্রসূয়তে।। (১০/৩০)
বঙ্গানুবাদ: শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট চণ্ডাল নামক সন্তানের জন্ম দেয়, সেইরকম সূত (ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত সন্তান সূত) প্রভতি অন্যান্য বাহ্যজাতি (বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা এবং আয়োগব) অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষ চারবর্ণের নারীতে আরও বেশি বাহ্য অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় সন্তান উৎপাদন করে।

নিষাদো মার্গবৎ সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্।
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্তনিবাসিনঃ।। (১০/৩৪)

বঙ্গানুবাদ: আয়োগবজাতীয় (শূদ্র পুরুষ থেকে বৈশ্যনারীর গর্ভজাত সন্তান হলো আয়োগব) নারীতে নিষাদজাতীয় পুরুষ (ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রা নারীতে জাত সন্তানকে নিষাদ বলে) 'মার্গব' নামক সঙ্কর সৃষ্টি করে থাকে। তাদের দাস বলা হয়; আর্যাবর্তনিবাসিগণ তাদের কৈবর্ত নামে অভিহিত করেন। তারা নৌকর্মের দ্বারা জীবিকার্জন করে। (নৌকর্ম হলো নৌকা চালান, তার দ্বারা জীবন ধারণ করা।)

কারাবরো নিষাদাত্তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ।। (১০/৩৬)
বঙ্গানুবাদ: নিষাদ পুরুষ থেকে 'বৈদেহী' নারীতে (বৈশ্য পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানকে বৈদেহ বলে) 'কারাবর' জাতি জন্মে; এরা চামড়ার কাজ করে। কারাবর এবং নিষাদজাতীয়া নারীতে 'বৈদেহিক' পুরুষ থেকে 'অন্ধ্র' এবং 'মেদ' এই দুই বর্ণসঙ্কর সৃষ্ট হয়; গ্রামের বাইরে এদের বাসস্থান।

চাণ্ডালৎ পাণ্ডুসোপাকন্ত্বক্সারব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে।। (১০/৩৭)
বঙ্গানুবাদ: চণ্ডালজাতীয় পুরুষ থেকে বৈদেহজাতীয় নারীতে 'পাণ্ডুসোপাক' নামক বণসঙ্করের উৎপত্তি; এরা বাঁশ থেকে ঝোড়া-চুব্ড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করে জীবিকা নির্বাহ করে। নিষাদ পুরুষের ঔরসে ঐ 'বৈদেহী' নারীতেই 'আহিণ্ডিক' জাতির উৎপত্তি। (তাদেরও ঐ একই বৃত্তি।)

নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্।। (১০/৩৯)
বঙ্গানুবাদ: নিষাদজাতীয়া নারী চণ্ডালজাতীয় পুরুষ থেকে 'অন্ত্যাবসায়ী' নামক সন্তান প্রসব করে; সে শ্মশানের কাজে নিযুক্ত হয়; সে নিকৃষ্টজাতিরও নিন্দিত।

অন্ত্যজ জাতিগোষ্ঠির উৎপাদনরহস্য নিয়ে এরকম ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত-শ্লোক মনুসংহিতায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এই সঙ্করায়ন-প্রক্রিয়ায় অনন্তপ্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হতে পারে বলে খোদ শাস্ত্রকারই এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই বাস্তবে এই অচ্ছ্যুৎ বর্ণসঙ্কর চেনার উপায় বা প্রক্রিয়া কী হবে, এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে। হয়তো এসেছেও। নইলে পবিত্র মনুসংহিতায় এরকম শ্লোক আসতো কি ?

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ।। (১০/৪০)
বঙ্গানুবাদ: পিতা-মাতার নাম নির্দেশপূর্বক এইসব হীন সঙ্করজাতির কথা বলা হলো; এছাড়া যাদের পিতা-মাতার নাম জানা যায় না, এমন যারা গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্যভাবে বর্ণসঙ্কররূপে উৎপাদিত হয়, তাদের জাতিপরিচয় তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে জানতে হবে। কারণ-

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।

ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ।। (১০/৫৯)

বঙ্গানুবাদ: জন্মগত দোষযুক্ত ব্যক্তি পিতার দুষ্ট স্বভাব অথবা মাতার নিন্দিত স্বভাব অথবা উভয়েরই স্বভাবের অনুবর্তী হয়। যে লোক দুর্যোনি অর্থাৎ বর্ণসঙ্করজাত নিন্দিত ব্যক্তি, সে কখনো নিজ জন্মের কারণ অর্থাৎ পিতামাতার স্বভাবকে গোপন করতে পারে না।

স্বার্থগৃধ্নুতায় ক্ষমতাদর্পী বৈদিক ব্রাহ্মণ তথা স্বঘোষিত উচ্চবর্ণধারী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠিটা কী জঘণ্য বর্ণবিদ্বেষী হতে পারে মনুসংহিতায় উদ্ধৃত উপরোক্ত অবশ্য-পালনীয় শ্লোকগুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এরকম শত-সহস্র বর্ণবিদ্বেষী শ্লোক গোটা মনুসংহিতা জুড়ে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। মজার ব্যাপার হলো, বৈদিক বা আর্য-সভ্যতার বাইরে আর কোন দেশে বা সভ্যতায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব মনুসংহিতায় স্বীকার করা হয়নি। হয়তো এটাই মনুকৃত একমাত্র সত্যবাদিতা বা বাস্তবতা স্বীকার। তবে আর্য-সভ্যতার বাইরেও পৃথিবীতে যে আরো বহু দেশ রয়েছে বা থাকতে পারে তা হয়তো অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। ফলে সেসব দেশেও শাসক সম্প্রদায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং তাদের অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে এরা এতোই একদেশদর্শী ছিলো যে, মনুসংহিতা অনুযায়ী শাসকশ্রেণী ক্ষত্রিয় হলেও সেসব দেশের শাসককে উচ্চবর্ণের ক্ষত্রিয় বলে গ্রহণ করা সংগত নয়। কারণ উপনয়নাদি-সংস্কার পালন না করা এবং 'ব্রাহ্মণ' নামক বেদাংশে বিহিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে ওরা শূদ্র হয়ে গেছে। মনুশাস্ত্র অনুযায়ী-

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।। (১০/৪৪)

বঙ্গানুবাদ: পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ– এই সব দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ তাদের কর্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

কী তাদের কর্মদোষ ?

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।। (১০/৪৩)

বঙ্গানুবাদ: ওই সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিগণ পুরুষানুক্রমে উপনয়নাদি, নিত্যাগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করায় এবং 'ব্রাহ্মণ' নামক বেদাংশে বিহিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করায় ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

০৭

ধর্মীয় মোড়কে সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যবাদই পৃথিবীর প্রাচীনতম বর্ণবাদী দর্শন। এবং বেদ-নির্যাস হিসেবে স্বীকৃত মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা যদি এ দর্শনের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক ভিত্তিমূল হয় তাহলেই বলতেই হয়, এটা কেন সম্পূর্ণ মানবতা-বিরোধী একটা অসভ্য দর্শন হবে না ? একটা সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠিকে জঘণ্যতম বর্ণাশ্রমে বিভাজিত করা এবং একজন কাল্পনিক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা'র নাম দিয়ে সমাজের উৎপাদনসংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে ক্ষমতায় আসীন শাসক গোষ্ঠির প্রতিভূ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নামের এক স্বার্থান্বেষী পরভোজী শ্রেণীর সেবাদাস বানিয়ে ফেলা যে একটা চতুর রাজনীতি, তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। এ রাজনীতির পেছনে যে গভীর ও সূক্ষ্ম কূটাভাষ লুকিয়ে আছে তা হলো নিকৃষ্টবর্ণ শূদ্রসংশ্লিষ্টতায় কতকগুলো বর্ণবহির্ভূত অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করে গোটা জনগোষ্ঠিকে প্রথমে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হলো- উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী। ক্ষমতালিপ্সু শাসক বা ক্ষমতাসীনরা উৎকৃষ্ট বা উচ্চশ্রেণীভুক্ত আর্য, আর শ্রমজীবী শাসিতরা হলো নিকৃষ্ট বা নিম্নশ্রেণীর অনার্য

শূদ্র। এই শ্রেণীবিভেদ তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি এরা। যেহেতু শাসিতরাই সংখ্যাধিক্যে বিপুল, তাই সুকৌশলে এদের মধ্যে আবার তৈরি করা হলো বিষাক্ত বিভেদের এক ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা। আজব এক সত্তার জন্ম দেয়া হলো- যার নাম অস্পৃশ্য (Untouchable)। মারাঠি ভাষায় যাকে বলা হয় 'দলিত', অর্থাৎ নির্যাতিত।

ধর্মের অলৌকিক মোড়কে ঘটানো এই রাজনৈতিক কূটচালে খুব স্বাভাবিকভাবে ধরাশায়ী হলো বিশাল এক জনগোষ্ঠি। লেখাপড়া বা শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে তাদেরকে চিরকালের অন্ধ বানিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রও খুব ভালোভাবেই নিষ্পন্ন হলো। একটা প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার সামাজিক কাঠামোকে ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে তার জায়গায় ধীরে ধীরে কার্যকর করা হলো একটা তীব্র বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদ। যার নাম বৈদিক বা আর্য সভ্যতা। এভাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে বহিরাগত লুণ্ঠনকারী আর্যদের চাপিয়ে দেয়া ট্র্যাজিক অবদান ব্রাহ্মণ্যবাদ। এরপর শত সহস্র বছর ধরে প্রতিপালিত এই বিষাক্ত বর্ণদর্শন মিশে গেলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর অবশ্যপালনীয় উপাচার ও সংস্কৃতির রক্তে। তা থেকে আর মুক্ত হতে পারেনি এই সমাজ। মুক্ত হওয়া এখনো যে সম্ভব হয়নি তার প্রমাণ বর্তমান বাংলা ও ভারতীয় হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষঙ্গগুলো। বিবাহে, প্রয়ানে, সামাজিক অনুষ্ঠানে এই বর্ণাশ্রমের বিষাক্ত থাবা আজো আদিরূপেই বর্তমান। যদিও তা দৃশ্যমান স্বরূপে ততোটা আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু অন্তর্গত অবস্থানে কোনভাবেই কম ক্রিয়াশীল নয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিমূল এই মনুসংহিতা অধ্যয়নে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান খরচ করলেই এর তীব্র ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায় খুব সহজেই। এমন মানববিদ্বেষী বিষাক্ত বিধান কোন স্রষ্টা নামীয় অলৌকিক মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারে কিনা তা সন্দেহ করা অযৌক্তিক হবে কি ? হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও বিদ্বেষমূলক জীবনাচারের প্রয়োজনেই এর শ্লোকগুলো বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। ভূমি নিয়ে বিরোধের প্রেক্ষিতে কিভাবে জমি ও বাসস্থানের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে, সীমানায় কী গাছ বা উদ্ভিদ রোপন করলে স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। কিংবা যে লোক আবদ্ধ জলস্রোতের বাঁধ ভেঙে দেয় তার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিতে হবে অথবা মাথায় বস্ত্রাদি বেষ্টন করে বা চর্মপাদুকা পরে ভোজন করা হলে পরিণতি কী হবে; নতুবা কোন্ বস্তু উষ্ণ অবস্থায়, কোন্ বস্তু ঠাণ্ডা অবস্থায়, কোন্ দ্রব্য তিনদিন পরেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, রসুন কারা খেতে পারবে, কখন লবণ বিক্রি করা যাবে না বা রাজা দেবতার প্রতিনিধি ইত্যাদি বিধান রচনায় কোন অলৌকিক উৎস থাকার দাবী একান্তই হাস্যকর মনে হয়। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার খুটিনাটি উপাচার ও কর্তব্য পালনের যে পৌনপুনিক অগুনতি বিধি রচিত হয়েছে তাতে এটা মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে মনুসংহিতার এক বা একাধিক শাস্ত্ররচয়িতারা আসলে চলমান পরিবেশ-প্রতিবেশেই লালিত-পালিত স্বেচ্ছা-অন্তরালবর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি।

তবু এটাই অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় সামাজিক আর্যবিধান হিসেবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। গৌতম বুদ্ধ এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী হলেও এর পর সুদীর্ঘকাল এই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপক্ষে আর টু-শব্দটি করার মতো কেউ দাঁড়াতে যে পারে নি, তার কারণও যুগে যুগে এই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিভূ বর্ণবাদী নেতৃত্বের নির্লজ্জ আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুকঠিন সামাজিক দ্বৈত-কাঠামো। এ বড় শক্ত দূর্গ। এ সবকিছু বিবেচনায় নিলে এটা ভাবা কি খুব অযৌক্তিক হবে যে জোর করে চাপিয়ে দেয়া বর্ণবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোনো নির্যাতিত শূদ্র বা অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠি কখনোই তার সমকালীন সমাজকে দুষিত করেনি, বরং এক কাল্পনিক স্রষ্টা ব্রহ্মার নামে কোনো চতুর স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালিপ্সু গোষ্ঠি কর্তৃক সৃষ্ট

মানবতাবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদই আমাদের এই প্রাচীন মানব সমাজকে ভয়ঙ্করভাবে দুষিত করে দিয়েছে ? যার বিষাক্ত নীল ছোবল পবিত্র মানবাত্মাকেই লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত করেছে।

অতঃপর আরেক বিদ্রোহীর উত্থান

শাক্যমুণি গৌতম বুদ্ধের প্রয়ানের দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পর তাঁর আর এক সার্থক বিপ্লবী অনুগামীর আবির্ভাব হলো এই ভারতবর্ষেই। যিনি মনু'র মানবতাবিরোধী শাস্ত্রধারী হিন্দুদের প্রচলিত জাত-পাতের ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-

> 'মনুসংহিতাকে হিন্দু ধর্মের আচরণবিধির পবিত্র গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। মনুস্মৃতিকে ব্রাহ্মণ জগদীশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, শূদ্রের সম্পদ অর্জনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছে। যে কোন বর্ণের নারী ব্রাহ্মণদের উপভোগের বস্তু। গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ্যবাদের কালাকানুন এবং সভ্যসমাজের কলঙ্ক। কাজেই গ্রন্থটিকে অবিলম্বে ভস্মীভূত করা প্রয়োজন।'

বর্ণবাদের অসভ্য উৎস হিন্দু সমাজের সংবিধান বলে খ্যাত মনুসংহিতা যে আদৌ কোন ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না, কিছু কুচক্রী স্বার্থান্বেষী লোভী ভণ্ড প্রতারক মানুষের শোষণের হাতিয়ার কেবল, আম্বেদকরই প্রথম উচ্চারণ করলেন তা। এবং খুব স্পষ্টভাবে ইতিহাস ঘেটে ঘেটে যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে। এমন তীব্র ও স্পষ্ট বক্তব্য এর আগের সুদীর্ঘ অতীতে আর কারো মুখ থেকে উচ্চারিত হতে শুনা যায় নি। কিন্তু চলমান বাস্তবতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই তাঁর। তাই তিনি এও বলেন-

> আমার কাছে আমার জীবন অপেক্ষা আমার দেশের স্বার্থ অনেক বড়। আমার অসহায় এবং নির্যাতিত দলিত সমাজের স্বার্থ তার চেয়ে বড়।
> শিক্ষা সংহতি ও সংগ্রামী ঐক্যই শূদ্র, দলিত-শোষিত সমাজের মুক্তি আনতে পারে। তোমরা সংঘবদ্ধ হও অধিকার আদায় করে লও।

তিনি উপমহাদেশের কোটি কোটি লাঞ্ছিত, দলিত ও মানবিক অধিকারহীন জনগণের মুক্তিদাতা, সারা বিশ্বে মানবাধিকার যোদ্ধা নামে খ্যাত এক দলিত পুরুষ বাবা সাহেব ড. ভীম রাও রামজি আম্বেদকর (Baba Saheb D. Bhima Rao Ramji Ambedkar)। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য-

> 'দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য এ অঞ্চল থেকে বর্ণ-বৈষম্য শোষণ নির্মূল করা দরকার। ...দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজ বিকাশের শত্রু হল ব্রাহ্মণ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ।'

তাঁর এ কথা বলার নেপথ্যশক্তি তিনি প্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধান প্রণেতা কিংবা ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী বা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও মনীষী বলে নয়। তিনিই ভারতের প্রথম দলিত (Dalit) গ্রাজুয়েট। যিনি তাঁর গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিলেন দলিত জনগোষ্ঠির মুক্তির লক্ষ্যে বর্ণবাদী অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত যিনি এই যুদ্ধ থেকে এক পা'ও পিছু হঠেননি। আদর্শের প্রশ্নে ছেড়ে কথা বলেননি ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুদের কট্টর প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীর চাতুর্যপূর্ণ রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজিকেও। আম্বেদকর মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' (harijan) শব্দটিকে বাতিল করে দেন এই যুক্তিতে যে, গান্ধীর (Gandhi) এই পদক্ষেপ নিতান্তই হঠকারী সমাজ-সংস্কারমূলক

ফাঁকা বুলি মাত্র। গান্ধীর উদ্দেশ্য দলিতদের মুক্তি নয়, বরং সংগঠিত দলিতদের জোটবদ্ধ আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার কূট-রাজনীতি। উপমহাদেশের নিপীড়িত দলিত সম্প্রদায়ের মুক্তি বিরোধী গান্ধীর এসব রাজনৈতিক কৌশলের সাথে কখনোই আপোষ করেননি আম্বেদকর। গোটা ভারত জুড়ে সর্বতোমুখি এক দলিত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান তিনি। তাঁর হাত দিয়েই দলিত সাহিত্য নামে এক মাটিবর্তি সাহিত্যের জন্ম হয়, যার মাধ্যমে তিনি হিন্দু বর্ণবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দলিত আন্দোলনে তাত্ত্বিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি যুক্ত করে সফল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যান। ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে দলিতরা হাজার বছরের নিগড় ভেঙে বর্ণ হিন্দুদের সংরক্ষিত চাভাকর লেক বা চৌদার পুকুর থেকে জলপান করেন, অসংখ্য দলিত অনুসারী নিয়ে তিনি ভারতীয় বর্ণবাদের আকরগ্রন্থ 'মনুসংহিতা' পুড়িয়ে এর মানবতাবিরোধী অবস্থানের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতীকী ও প্রত্যক্ষ অনাস্থা প্রকাশ করেন। দলিতদের শিক্ষার প্রতি ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে, যা এর আগে কল্পনাও করা যায় নি, তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২৮ সালে গঠিত 'ডিপ্রেসড ক্লাশেস এডুকেশন সোসাইটি'র মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে বোম্বেতে সিদ্ধার্থ কলেজ ও ১৯৫১ সালে আওরঙ্গবাদে মিলিন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফসল। তাঁর নেতৃত্বে দলিতরা নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে আম্বেদকরের এই বিপুল অবদান, যা সংক্ষেপে বলে শেষ হওয়ার নয়। আম্বেদকর আর দলিত আন্দোলন একই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। তাঁর উত্থানও এই হাজার বছরের অত্যাচারিত অচ্ছ্যুৎ দলিত সম্প্রদায় থেকেই। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তাঁর রক্তে মাংসে মনে মননে দলিত হবার কষ্টই বেজে গেছে আজীবন। কিন্তু হাজার হাজার বছরের গভীর শিকড়ে প্রোথিত পাহাড়ের মতো জেকে বসা এমন একটা অসম অটল ব্যবস্থার বিপরীতে তাঁর ছোট্ট জীবনের সর্বসত্ত্ব কতোটুকু আর ! গোটা দেশ জুড়ে তীব্র এক ঝড় উঠালেও টলাতে পারেননি তিনি এই অসম ব্যবস্থাকে। শেষপর্যন্ত বুদ্ধের মতোই বর্ণান্ধ হিন্দু সমাজ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আরেকটি সামাজিক বিদ্রোহের সূচনার দিকেই এগিয়ে গেলেন, লক্ষ লক্ষ দলিত অনুসারী নিয়ে।

তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন-

> "...নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের হিন্দু হয়েও যদি সম অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, বিগত ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা সংগ্রাম করেও তাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র ন্যায়বোধের পরিচয় পাওয়া না যায় তাহলে নির্যাতিত সমাজকে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। তাই দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে আত্মসম্মান ও মানবিক অধিকার লাভ করতে হলে হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। ... আমার চরম দুর্ভাগ্য যে, অস্পৃশ্য সমাজে জন্মেছি বলে আমাকে আত্মসম্মানহীন অপমানজনক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।"

এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন-

> "আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও অস্পৃশ্য হয়ে মরবো না।"

অতঃপর দার্শনিক স্থিরতা দিয়ে মানুষের সাম্যের জায়গাটাকে খুঁজে গেছেন আজীবন।

মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত গরীব ও একেবারে নিচু তলার এক দলিত মাহার (Mahar) বা চর্মকার পরিবারে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে জন্ম আম্বেদকরের। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলো দলিত সম্প্রদায়ের বাস হলেও এদের মধ্যে মাহাররাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মাহারদের আলাদা কোন গ্রাম বা পল্লী ছিলো না। প্রতিটা হিন্দু গ্রামের উপান্তে বা প্রান্তসীমায় দু-চার ঘর মাহার থাকতো। গ্রামের প্রধান এলাকার বাইরে ঘর বেঁধে

থাকতে হতো। তাদের কাজ ছিলো গ্রাম পাহারা দেয়া, গ্রামের মরা পশু অপসারণ করা, গ্রাম-প্রধান বা মোড়লদের হুকুম অনুযায়ী সমাজের সামষ্টিক কাজে বেগার খাটা, ময়লা পরিষ্কার করা ইত্যাদি। মাহারদের অসংখ্য কর্তব্য থাকলেও কোন জীবিকার ব্যবস্থা ছিলো না। বর্ণ হিন্দুদের বাড়ির এঁটো কুড়িয়ে, কাটা ক্ষেতের পরিত্যক্ত ফসল কুড়িয়ে, মরা পশুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করে, আর মরা পশুর মাংস খেয়ে জীবন কাটাতে হতো তাদের। এদের অস্পৃশ্যতা এতোটাই তীব্র ছিলো যে, তাদের ছোঁয়া লাগলে, এমনকি ছায়া মাড়ালেও উচ্চ শ্রেণীর স্পর্শদোষ ঘটত। বর্ণভিত্তিক সমাজে এরা শূদ্রেরও অধম। এক সময়ে তাদের গলায় মাটির পাত্র বাঁধতে বাধ্য করা হতো, যাতে তাদের থুতু মাটিতে পড়ে দূষণ সৃষ্টি না করে। আরেকটি বাধ্যবাধকতা ছিল, পেছন দিকে ঝাড়ু বেঁধে রাখা যাতে অন্যদের চোখে পড়ার আগে তাদের পায়ের ছাপ মুছে যায়। এরকম একটি পরিবারে জন্ম নিয়ে ভবিষ্যৎ যে কোথায় নির্ধারিত হয়ে যায় তা কল্পনারও বাইরে। কিন্তু যে অছ্যুৎ জাতির জন্য একজন আম্বেদকরকে পেতে হবে তাদের প্রথম স্বপ্ন তৈরি হতে, নিজের দিকে ফিরে তাকাতে, আত্মমুক্তি ঘটাতে, তাদের বৌদ্ধিক উত্তরণ ঘটাতে, তাদের জন্য একজন আম্বেদকরের জন্ম হয়ে যায় ঠিকই।

স্কুলজীবনের শুরুতেই হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী জাতিভেদ প্রথা তথা অস্পৃশ্যতার অভিশাপের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তাঁর শিশুমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে থাকে। ছাত্রজীবনের অপমানজনক দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার তাঁর সংবেদনশীল কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি করে। অস্পৃশ্যের সন্তান বলে স্কুলে বেঞ্চটুলের পরিবর্তে ক্লাশের একেবারে পেছনে ছালার চটে তাঁকে বসতে দেয়া হতো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁর বইখাতা স্পর্শ করতেন না, থুথুর ছোঁয়ায় বাতাস দুষিত হবে বলে তাঁকে ক্লাসে কোন পড়া জিজ্ঞাসা করা হতো না, এমনকি খড়িমাটি অপবিত্র হয়ে যাবে এই শংকায় তাকে বোর্ডে পর্যন্ত লিখতে দেয়া হতো না। স্কুলে স্বহস্তে জল পান করতে পারতেন না। তাঁর মুখের উপর পাত্র উঁচু করে জল ঢেলে দেয়া হতো। উঁচু বর্ণের সহপাঠিদের টিফিন বক্সগুলোয় যাতে তাঁর কোনরূপ ছোঁয়া না লাগে সেজন্য সাবধানে দূরে সরিয়ে রাখা হতো। এরকম বহু নির্মম ঘটনা তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছিলো অবশ্যই। কিন্তু এসবই একজন মুক্তিকামী আম্বেদকরের উন্মেষ ঘটায়। অস্পৃশ্যদের মুক্তির দিশারী দলিত আন্দোলনের বীজ হয়ে মানবতার খোঁজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে দেয় আম্বেদকরকে। পরবর্তীকালের প্রতিটা আন্দোলনের উৎস ও ফলাফল বিশ্লেষণ করলে একটাই প্রতিপাদ্য পেয়ে যাই আমরা, মানবতার সন্ধান। মানুষ হয়ে যে সমাজের মানুষদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই তাদের প্রতি ঘৃণায় ক্ষোভে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তিনি। পাশাপাশি খুঁজতে থাকেন মানবতার সাম্যের অমিয়বাণীর উৎসটাকে।

> 'তিনটি শব্দের মধ্যে আমার জীবন দর্শন খুঁজে পাই। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। যদিও আমরা ভারতীয় সংবিধানে রাজনৈতিক কারণে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতিকে গ্রহণ করেছি বস্তুত আমাদের সমাজ জীবনে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলো আমি বুদ্ধের বাণী থেকে গ্রহণ করেছি। হিন্দু ধর্মে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কোন স্থান নেই, তাই বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করলে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ পরস্পরের পরিপূরক হবে।'

'কেন আমি বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি' শীর্ষক প্রচারিত এক বক্তৃতায় বলেন-

> 'আমি তিনটি নীতির জন্য বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি। প্রথমটি হলো প্রজ্ঞা (অলৌকিক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত জ্ঞান), দ্বিতীয়টি হলো করুণা (প্রেম অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর

প্রতি ভালোবাসা) এবং তৃতীয়টি হলো সাম্য (সমতা অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে সমান মনে করা)।'

শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামী নিয়ে এই বৌদ্ধধর্মেই দীক্ষা নিয়ে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক মুছে এক নবজন্ম নিয়েছিলেন, এবং দিয়েছিলেন অন্যদেরকেও। অস্পৃশ্য হয়ে জন্মালেও অস্পৃশ্য হয়ে মরেননি তিনি। বুদ্ধের পবিত্র আলো বুকে ধরে এক মহান পাহাড়ের সৌম্য স্থিরতা নিয়ে মহানির্বাণে প্রস্থান করলেন।

আজ আম্বেদকর নেই। রয়ে গেছে তাঁর কর্মযজ্ঞ। অথচ বর্ণান্ধতার গোঁড়ামি থেকে হিন্দু সমাজ মুক্ত হতে পারলো না আজো। এ আমাদেরই নিরন্তর মূর্খতা, অনপনেয় কলঙ্ক। একজন আম্বেদকর কষ্টে, যাপনে, বিদ্রোহে, সাম্যে সারাটা জীবন পথ দেখিয়ে গেছেন ঠিকই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তারপরও যদি মহামূর্খ আমরা চোখ বন্ধ করেই থাকি, অধোগামিতার প্রলয় কি বন্ধ হবে আদৌ ?

এক জীবনে বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং...

অচ্ছ্যুৎ পরিবারে পিতা রামজী মালোজী শকপাল ও মাতা ভীমাবাঈ-এর ১৪ সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন আম্বেদকর। পারিবারিক নাম ভীমরাও। যদিও চৌদ্দজন ভাই বোনের মধ্যে ৫ জন বেঁচে ছিলেন, ৩ ভাই ২ বোন। বলরাম, আনন্দরাও, মঞ্জুলা, তুলসী ও সর্বশেষ ভীমরাও। পৈতৃক বাড়ী ছিল তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার আম্বেদাবাদ গ্রামে। পিতা রামজী শকলাল মধ্যপ্রদেশের 'মোউ' সেনানিবাসে চাকুরিকালীন সময়ে ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল আম্বেদকরের জন্ম। পুত্রের নাম রাখা হলো ভীমরাও শকপাল। আম্বেদকর হলো পার্শ্ববর্তী এক গাঁয়ের নাম। স্কুলজীবনে প্রবেশের পর এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক কৌতুহলবশত শকপালের স্থলে ভীমরাও এর সাথে জুড়ে দেন আম্বেদকর শব্দটি। সেই থেকে

ভীমরাও শকপাল হয়ে গেলো ভীমরাও আম্বেদকর। তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকেই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈনিক ছিলেন। তাঁর পিতামহ মালোজী শকপালও সৈনিক ছিলেন। থানা জেলার অন্তর্গত মুরবাদ গ্রামের মুরবাদকর পরিবারের তাঁর মাতামহরাও ছিলেন সামরিক বাহিনীর সুবেদার-মেজর।

পিতা রামজী শকলাল মারাঠি ও ইংরেজিতে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে শিক্ষানুরাগ ও ধর্মপরায়নতা তাঁর চরিত্রের অংশ হয়ে উঠেছিলো। ফলে সন্তানদেরকে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। সাথে সাথে উৎসাহিত করতেন হিন্দু ধর্মের ক্লাসিকগুলো অধ্যয়নের জন্য। সেনাবাহিনীর সুবেদার হিসেবে সামরিক বাহিনীর চাকুরি থেকে রামজী শকলাল ১৮৯৪ সালে যখন অবসর নেন তখন আম্বেদকরের বয়স সবে দুই বছর পেরিয়েছে। এর দু'বছর পরে রামজী বোম্বাই প্রদেশের সাতারার সেনাবানিবাসের একটি স্কুলে চাকুরি জোগাড় করে সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এরই মধ্যে আম্বেদকরের মাতা ভীমাবাঈ মারা গেলেন। ভীমাবাঈয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভুত রামজী তাঁর একমাত্র বোন মীরাবাঈকে সংসার দেখাশুনার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এলেন। তিনি সাংসারিক কাজে খুব অভিজ্ঞ ও কর্মঠ ছিলেন। ইতোমধ্যে ১৮৯৮ সালে আম্বেদকরের বাবা রামজী শকপাল পুনরায় বিয়ে করেন। আম্বেদকরের বয়স তখন ৫/৬ বৎসর। পিতার এই দ্বিতীয় বিয়েকে আম্বেদকরের শিশুমন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে অধিকাংশ সময় পিসীর সাহচর্যেই কাটাতেন। মাতৃহারা আম্বেদকরকে তিনি মাতৃস্নেহে বেঁধে রাখতেন।

ছেলের স্কুলে পড়ার বয়স হলে সেনাবাহিনীর চাকুরির সুবাদে বহু অনুনয় বিনয় করে রামজী শকলাল তার পুত্রকে সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেলেন। আম্বেদকরের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাজীবন শুরু হলো সাতারাতে। আর স্কুলজীবনের শুরুতেই হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী জাতিভেদ প্রথা তথা অস্পৃশ্যতার অভিশাপের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা শুরু হলো তাঁর।

বাল্যকাল বা স্কুল জীবন থেকে প্রতি পদক্ষেপে যেভাবে তিনি সামাজিক বঞ্চনা, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হয়েছিলেন তখন থেকে তাঁর মধ্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছিলো। তাঁর জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলো তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে শক্তি যুগিয়েছে। একসময় স্কুলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণে স্কুল এবং পড়াশুনার প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মে যায় এবং প্রায়শই স্কুল পালাতে থাকেন তিনি। তবু লক্ষ্যকে তাঁর দৃষ্টি থেকে কখনো ফিরিয়ে নেননি। এদিকে বিমাতাকে মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না। ফলে কচি আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি এ পরিস্থিতিতে স্বাধীন জীবিকার্জনের কথা চিন্তা করে বোম্বাইতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সেখানে যেতে অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন। তাঁর কাছে কোন টাকা পয়সা নেই। অগত্যা পিসীমার কোমরে বাঁধা থলিটির দিকে ভীমের নজর পড়লে একদিন তা ভাগিয়ে নিয়ে থলিটিতে প্রত্যাশিত পয়সা না পেয়ে অতিশয় হতাশ হয়ে পড়েন। আর এই সময়টাতেই তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁর কথা থেকেই জানতে পারা যায় যে, এই পরিবর্তনের কারণেই তিনি পরবর্তীতে নিজেকে ড. আম্বেদকর হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন-

> 'ঠিক করলাম যে আমি স্কুল পালানোর অভ্যাস ত্যাগ করবো এবং পড়াশুনার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করবো, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব স্কুলের পাঠ সেরে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শুরু করতে পারি।'

এরই মধ্যে চাকুরির কারণে রামজী শকপাল সপরিবারে বোম্বাই চলে এলেন। ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া নিলেন যা ৬/৭ জন সদস্যের পক্ষে কোনক্রমেই মাথাগোজা সম্ভব নয়। আম্বেদকরকে মারাঠা হাইস্কুলে

ভর্তি করানো হলো এবং স্কুলের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ পিতার সযত্ন শিক্ষাদানে তাঁর পড়াশুনায় প্রভূত উন্নতি দেখা দিলো। অন্য ভাইদের পড়াশুনা আর না হলেও পিতা রামজী ভীমের পাঠস্পৃহা দেখে চরম অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর জন্য বিভিন্ন বইপত্র সংগ্রহ করে আনতেন। পড়াশুনায় উত্তরোত্তর মনোযোগ ও উন্নতি লক্ষ্য করে তাঁকে বোম্বাইর বিখ্যাত স্কুল এলফিনস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি করানো হলো। আম্বেদকরই হলেন এলফিনস্টোন রোডের আশেপাশের এলাকায় এখানকার প্রথম ও একমাত্র অস্পৃশ্য ছাত্র।

এই নামকরা স্কুলে ভর্তি হয়ে শত অবহেলা অপমানের মধ্যেও পড়াশুনার প্রতি তাঁর মনোযোগ আরো বেড়ে গেলো। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। সবার জন্য একটিমাত্র ঘর। সেখানে রান্নাবান্না, থাকা-খাওয়া, জ্বালানি কাঠের স্তুপ, ঘরের এক কোণে থাকতো একটি ছাগলও। থাকার জায়গার অভাবে পিতা রামজী একটি কৌশল বের করলেন। সন্ধ্যার পর আম্বেদকর ঘুমোতে যেত এবং পিতা রামজী জেগে থেকে তাঁর পাঠ তৈরি করে দিতেন। রাত দুটো বাজলে তিনি আম্বেদকরকে জাগিয়ে তার জায়গায় শুয়ে পড়তেন। আম্বেদকর সারারাত ধরে নিরিবিলিতে পড়াশুনা করতেন। একদিকে পারিবারিক অসুবিধা অন্যদিকে এলফিনস্টোন হাইস্কুলের মতো ঐতিহ্যবাহী স্কুলেও বর্ণহিন্দু সহপাঠি ও শিক্ষকদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা ও বিষোদ্গার সত্ত্বেও ১৯০৭ সালে এলফিনস্টোন হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সে সময়কালে একজন অস্পৃশ্য মাহার সম্প্রদায়ের ছেলের প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ছিলো অকল্পনীয় ব্যাপার। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলফিনস্টোন কলেজে আইএ ক্লাশে আম্বেদকরই হলেন ভারতবর্ষের প্রথম কোন অস্পৃশ্য ছাত্র। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়, যার পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক এস.কে বোলে এবং সমাজসেবী শিক্ষক অর্জুন কেলুশকার, যিনি দাদা কেলুশকার নামে পরিচিত। কৃতিত্বের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসাহিত করে অর্জুন কেলুশকার প্রীতি উপহার হিসেবে 'গৌতম বুদ্ধের' একটি জীবনী গ্রন্থ আম্বেদকরের হাতে তুলে দেন। এই বইটিই পরবর্তীকালে আম্বেদকরের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলো।

সে আমলে অল্প বয়সে বিয়ের রেওয়াজ থাকায় প্রবেশিকা পাশ করার পর আম্বেদকরের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর বিয়ের আয়োজন করা হলো। দাপোলীর সগোত্রীয় সম্প্রদায়ের ভিখু ওয়ালঙ্করের নয় বছর বয়েসী কন্যা রমাবাঈয়ের সাথে ভীমরাও আম্বেদকর ১৯০৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই রমণীর গর্ভে তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। কন্যা ইন্দু শৈশবেই মারা যায় এবং এক পুত্র রাজরত্ন ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে মারা যায়।

১৯১০ সালে এলফিনস্টোন কলেজ থেকে আই.এ পাশ করার পর অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হবার খবর পেয়ে শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক অর্জুন কেলুশকার আম্বেদকরকে নিয়ে বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করেন। সব শুনে মহারাজা তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থে যাবতীয় সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁকে একই কলেজে বি.এ পড়ার খরচ জোগান। ১৯১২ সালে সেখান থেকে বি.এ পাশ করেন এবং ঠিক তার পরের বছর ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনের অন্যতম সহায়ক শক্তির উৎস পিতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়লেও বর্ণবাদের শিকার হয়ে শৈশবের অপমান, নির্যাতন, অবজ্ঞা, অত্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে অধিকার অর্জনের সংগ্রাম

তাঁকে সর্বদাই তাড়িত করছিলো। আর এ শুধু তাঁর নিজের অধিকার আদায়ের লড়াই নয়, শত সহস্র বছরকাল ধরে নির্যাতিত, শোষিত, লাঞ্ছিত কোটি কোটি অস্পৃশ্য মানব সন্তানদের মানুষ হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাঁচার লড়াই। তা করতে হবে সেই কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠিটার সাথে যারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, অর্থ, কূটনীতি, ধূর্ততায়, শঠতায়, হিংস্রতায়, ধর্মান্ধতায় বহুগুণ শক্তিশালী। এদের সাথে লড়তে হলে প্রথমে নিজেকে সেভাবেই যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এই প্রস্তুতির জন্য চাই যতো বেশি সম্ভব জ্ঞানবলে বলীয়ান হওয়া। জীবনের এ পর্যায়ে এসে আম্বেদকর যে আর দমবার পাত্র নন। তিনি দমে যাননি।

ইতোমধ্যে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের অর্থায়নে অস্পৃশ্য মেধাবী ছাত্র হিসেবে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ মিলে গেলো। শর্ত হলো আমেরিকা থেকে ফিরে বরোদার মহারাজার অধীনে ১০ বছর চাকরি করবেন আম্বেদকর। আমেরিকায় পা দিয়ে এই প্রথম যেন তিনি মুক্তির স্বাদ পেলেন। স্বদেশের মতো এখানে নেই প্রতিনিয়ত জাত, পাত, বর্ণ ও অস্পৃশ্যতার ভণ্ডামি। সবার সাথে একত্রে খেতে পারা, বসতে পারা, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারা, যেন নতুন এক স্বপ্নলোক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে পাঠের বিষয় করে তিনি কঠোরভাবে পড়াশুনায় নিমগ্ন হলেন। ১৯১৫ সালে 'Ancient Indian Commerce' বিষয়ে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯১৬ সালের জুন মাসে 'National Dividend of India- a Historic and Analytical Study' বিষয়ে তাঁর লিখিত থিসিসের জন্য ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯১৭ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শিক্ষাশেষে এর মধ্যেই তিনি জাহাজযোগে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং ১৯১৭ সালের ২৪ আগস্ট বোম্বাইতে পৌঁছে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

তাঁর কর্মজীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তিনি পুনরায় ১৯২০ সালের জুলাই মাসে উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত যান। সেখানে 'London School of Economics and Political Science' কলেজে ভর্তি হন এবং তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'Provincial Decentralisation of Imperial Finance in British India' বিষয়ের উপর M.Sc ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২২ সালে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অর্থাভাবে সেবারের গবেষণা শেষ করতে পারেন নি। ১৯২৩ সালে পুনরায় লন্ডনে ফিরে এসে 'The Problem of the Rupee' নামক প্রবন্ধের উপর গবেষণা কাজ চালিয়ে D.Sc উপাধি লাভ করেন। এরপর লন্ডনে ওকালতি শুরু করেন এবং সেখান থেকে Bar-at-Law ডিগ্রী লাভ করেন।

স্বদেশে ফিরেই ১০ বছর চাকুরি করার অংগীকার অনুযায়ী ড. আম্বেদকর বরোদা স্টেট-এ যোগদান করলেন। মহারাজা তাঁকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে তার আগে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রথমে সামরিক সচিব হিসেবে নিয়োগ দিলেন। প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেও এতোবড়ো পদবীধারী বিদ্বান ব্যক্তিকে ফের অস্পৃশ্যের সেই পুরনো ঘৃণ্য আগুনে পড়তে হলো। অফিসের শিক্ষিত কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পিওন পর্যন্ত কেউ তাঁর সাথে কথা বলতো না, তাঁর ফাইল-পত্র টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারা হতো, এমনকি অফিসে রক্ষিত পানীয় জল খেতে পারতেন না। এ সময়ে থাকার কোন সুব্যবস্থা না থাকায় তিনি বংশ পরিচয় গোপন রেখে এক পার্সী হোটেলে অবস্থান করছিলেন। ক'দিন পর পার্সীদের কিছু লোক জানতে পারলো যে, তাদের হোটেলে অবস্থানকারী লোকটি একজন অস্পৃশ্য

শ্রেণীভুক্ত, সে হিন্দু নয়। তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠলো তারা। দলবদ্ধ হয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। আম্বেদকর কর্মদিবস শেষে হোটেলে প্রবেশের পূর্বেই বিক্ষুব্ধ পার্সী লোকজন কর্তৃক বাধাগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হলেন। এরপর তারা জোর করে তাঁকে সে স্থান ত্যাগ করতে বললো এবং তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পাশ্চাত্যের সুধীমহলে বিপুলভাবে অভিনন্দিত কীর্তিমান এই ছাত্রটিকে শেষপর্যন্ত স্বদেশের অশিক্ষিত, মুর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের তাড়া খেয়ে নিরাশ্রিত হয়ে সারাদিন গাছতলায় বসে বড় বিষণ্ন মন নিয়ে ভাবতে হয়েছিলো, অস্পৃশ্যরা কি হিন্দু নয় ? আম্বেদকর এই ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে মহারাজাকে চিঠি লিখলেন। মহারাজা তাঁর দেওয়ানকে এর বিহিত ব্যবস্থা করতে বললে দেওয়ান তার অক্ষমতার কথা মহারাজাকে জানিয়ে দিলেন। এর অল্প ক'দিন পরেই এক বুক কষ্ট নিয়ে আম্বেদকর বোম্বাই ফিরে এলেন। এ ঘটনায় হিন্দু সমাজের জঘন্যতম রূপটিও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো। এর উৎসটাকে চিহ্নিত করতেও তাঁর কষ্ট হলো না।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন...

বরোদা থেকে আম্বেদকর যখন বোম্বাই ফিরে এলেন এবং সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স এ্যান্ড ইকনমিক্স কলেজে আইনের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন, এখানেও অস্পৃশ্যতার ন্যাক্কারজনক থাবা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। বর্ণহিন্দু ছাত্ররা প্রথমে তাঁর ক্লাশ বর্জন করলো, সহকর্মী শিক্ষকরা তাঁর সাথে এক টেবিলে বসে চা-পান ও গল্প-গুজব করতেন না এবং স্টাফরুমের কলসী থেকে জল পানের ক্ষেত্রেও তাদের আপত্তি ছিলো। এ সময়ে চলমান রাজনীতিতে ভারতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী জোরদার হয়ে উঠেছে। তখন ভারত সচিব মন্টেগু সাম্প্রতিক অবস্থা সরাসরি জানার জন্য ভারতে আসেন। বিভিন্ন সংগঠন ও জাতিগোষ্ঠি তার কাছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করতে লাগলো। এরই মধ্যে ১৯১৮ সালের ২৩ ও ২৪ মার্চ বোম্বাইতে ডিপ্রেসড ক্লাশেস মিশনের পক্ষে বরোদার মহারাজা সয়াজিয়া গাইকোয়ারের পৌরহিত্যে ভারতের অনেক নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বালগঙ্গাধর তিলক বলেন যে- অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের একটি মস্তবড় ব্যাধি এবং একে অবশ্যই দূর করতে হবে। স্বয়ং ভগবান অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করলেও তিনি করবেন না। অথচ সম্মেলনের ইশতেহারে যখন বলা হলো, কোন নেতা তাদের দৈনন্দিন জীবনে অস্পৃশ্যতা মানবেন না, তখন তিলকই সেই ইশতেহারে সই করলেন না।

রাজনীতির প্রাথমিক অভিজ্ঞতাতেই এমন জ্বালাময়ী বক্তব্য দানকারীদের স্বরূপটাকে ভালোভাবে বুঝে নিতে ভুল করলেন না তিনি। কথায় ও নিজের জীবনাচারে প্রচণ্ড স্ববিরোধী এসব চরিত্রের সাথে কখনোই আপোষকামী না হবার দৃঢ়তাটা আম্বেদকর তখনই নিজের মধ্যে ধারণ করে নিলেন। ফলে নেতৃস্থানীয় ইন্ডিয়ান স্কলার হিসেবে ড. আম্বেদকরকে মন্টেগু চেম্বসফোর্ড রিফর্মস এর ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পর্কে সাউথবোরো কমিটিতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষণের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। ফলে ১৯১৯ সালের নতুন আইনে (Government of India Act 1919) নির্যাতিত শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার প্রথম স্বীকৃত হয়। এ আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্যাতিত শ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ সময়ে অস্পৃশ্যদের শিক্ষার প্রসার ও জাতিগত বিধিনিষেধের অবসানকল্পে কোলাপুরের মহারাজা শাহু মহারাজ আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলে তাঁরই অর্থায়নে ১৯২০ সালে ড. আম্বেদকর 'মুকনায়ক' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যাতেই ড. আম্বেদকর হিন্দুধর্মীয় বৈষম্যনীতির কঠোর সমালোচনা করেন। এ বছরের মে মাসে নাগপুরে শাহু মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অস্পৃশ্যদের জন্য এটাই প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে ড.

আম্বেদকরের চেষ্টায় অস্পৃশ্য মাহারদের আঠারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলিতভাবে ভোজোৎসবের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ মাহার সম্প্রদায় গড়ে তোলা হয়। এরপরই ড. আম্বেদকর বিদেশী বন্ধু মিঃ নাভাল ভাথেনার আর্থিক সহযোগিতায় ব্যারিস্টারি সনদপ্রাপ্ত হওয়ার পর স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় নেমে পড়েন এবং নিজ যোগ্যতায় এতে সাফল্য অর্জন করেন।

ইতোমধ্যে নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এস.কে. বোলে কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করান। তা হলো পুকুর, জলাশয়, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারি অফিস, কোর্ট কাচারিতে নির্যাতিতদের সমানাধিকার থাকবে। আইনগতভাবে পাশ হলেও বাস্তবে তা কার্যকরি হলো না। এদিকে গান্ধীজী খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে মার খাওয়ার পর ১৯২৪ সালে 'হরিজন' সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এর পেছনে অস্পৃশ্যদের কল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই যে প্রধান ছিলো ড. আম্বেদকর তা বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই। একই বছর ১৯২৪ সালে ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের উপর চাপিয়ে দেয়া বাধা নিষেধ দূর করার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন থেকেই স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে সভাপতি করে ২৯ জুলাই 'বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির মাধ্যমে ১৯২৫ সালের গোড়া থেকেই দলিত সম্প্রদায়ের সহায়তামূলক কিছু শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ যেমন ছাত্রাবাস নির্মাণ, পত্রিকা প্রকাশ, ফ্রি রিডিং রুম স্থাপন, মাহার হকি ক্লাব গঠন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। ড. আম্বেদকরের এই উদ্যোগ দক্ষিণ ভারত তোলপাড়সহ ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও আছড়ে পড়ে নতুন এক আন্দোলনের ঢেউ তুলতে লাগলো।

এরই মধ্যে ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজে সংঘটিত আর একটি ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশব্যাপি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মুর্গেসন নামক একজন অস্পৃশ্য যুবক ঝড়-বৃষ্টিতে বিপণ্ন হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তাদের জন্য নিষিদ্ধ একটি মন্দিরে ঢুকে পড়লে মন্দির অপবিত্র করার দায়ে দণ্ডিত হয়ে উচ্চবর্ণ লোকদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। আম্বেদকর এ ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর 'মুক-নায়ক' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ফলাও করে ছাপতে থাকলে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে গিয়ে জ্বালাময়ী ও উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের মনে এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি করতে লাগলেন। আত্ম নির্ভরতা, আত্ম উন্নয়ন ও আত্মসম্মান, এই তিনটি মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন-

> 'আমাদেরও জন্মভূমির উপর অন্যান্যদের মতো সমান অধিকার রয়েছে, যে অধিকার থেকে আমাদেরকে শত সহস্র বছর ধরে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আজ মরনপণ সংগ্রাম করেও সে অধিকার আমাদের আদায় করে নিতে হবে।'

তিনি আরো বলতেন-

> 'আগে নিজেকে জাগ্রত করতে হবে। যারা মানুষ হয়েও সমাজে পশুর চেয়ে অধম, যুগ যুগান্তরে সমাজের প্রাণপণ সেবা করেও হিন্দু সমাজের যে সব ধূর্ত ও প্রবঞ্চকের দল তাদের শত সহস্র বছরকাল অস্পৃশ্যতার মালা পড়িয়ে কুকুর বিড়ালের চেয়েও বেশি ঘৃণ্য করে এসেছে সেই সমস্ত মানুষদের প্রথম প্রয়োজন মানুষের অধিকার লাভ। অন্যথায় তাদের জীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন ভিত্তি নেই।'

চৌদার পুকুর অভিযান ও বাবা সাহেব খ্যাতি অর্জন

১৯২৩ সালের কেন্দ্রীয় আইন সভায় গৃহীত 'বোলে প্রস্তাব' অনুযায়ী মাহাদ মিউনিসিপালিটি ১৯২৪ সালে চৌদার পুকুর অস্পৃশ্যদের জন্য মুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা প্রকাশ করেছিলো। কিন্তু মুসলমান ও খ্রীস্টানরা এই পুকুরের জল অবাধে ব্যবহার করলেও অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ ঠিকই বলবৎ রইলো। এমন কাগুজে ঘোষণার মধ্যে অস্পৃশ্যদের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকার প্রেক্ষিতে ১৯২৭ সালে ড. আম্বেদকর এবার সরাসরি কার্যকর আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এ বছরের ১৯ ও ২০ মার্চ মাহাদে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এ সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দশ হাজার প্রতিনিধি ও কিছু উদারমনা বর্ণহিন্দু ব্যক্তির উপস্থিতিতে ড. আম্বেদকর এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বলেন-

> 'আমরা যদি নিজেদের মর্যাদা নিজেরা সৃষ্টি করতে না পারি কেউই আমাদের মর্যাদা দেবে না এবং পদে পদে অপমান ও ঘৃণা করবে। আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের যদি আমাদের চেয়ে উন্নতস্তরে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা না করি তবে আমাদের সঙ্গে পশুদের পার্থক্য কোথায় ?'

এ সম্মেলনে প্রথম দিনে ১৯২৪ সালে গৃহীত বোলে প্রস্তাবসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়। এবং দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে চৌদার পুকুর অভিমুখে যান। ড. আম্বেদকর প্রথম পুকুরের জল স্পর্শ ও পান করে অস্পৃশ্যদের হাজার বছরের অনধিকার ভেঙ্গে দেন। সাথে সাথে সহস্র মানুষের জয়ধ্বনিতে পুকুর প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে এবং নির্যাতিত শ্রেণীর হাজার হাজার জনতা সমস্বরে ড. আম্বেদকরকে 'বাবা সাহেব' বলে আখ্যায়িত করলেন। এরপর জনতা আনন্দ মিছিল নিয়ে নিকটবর্তী বীরেশ্বর প্যান্ডেলে ফিরে আসেন।

এদিকে কুচক্রী বর্ণ হিন্দুরা অপপ্রচার করতে লাগলো যে, অস্পৃশ্যরা শুধু পুকুরের জলই অপবিত্র করে নাই, তার বীরেশ্বরের মন্দিরও অপবিত্র করতে আসছে। ফলে একদল হামলাবাজ অতর্কিতে প্যান্ডেল আক্রমণ করে। এ হামলার খবর ডাক বাংলোতে অবস্থানরত ড. আম্বেদকরের কানে পৌঁছলে তিনি দ্রুত পুলিশ কর্তৃপক্ষকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে কয়েকজন সহচর নিয়ে দ্রুত প্যান্ডেল অভিমুখে ছুটে এসে হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে জানালেন যে মন্দির অভিযানের কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। এমন সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেতৃবর্গ ও অস্পৃশ্য সাধারণ জনগণ তাদের প্রিয় নেতার সামনে এসে পাল্টা হামলা চালাবার নির্দেশ দানের জন্য আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে আইনানুগ ব্যবস্থায় বিহিত ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

আন্দোলনের তীব্রতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। দেশের সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন, কেউ আম্বেদকরের পাশে এস দাঁড়ালেন। এদের একজন বীর সাভারকর। যিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করলেন-

> অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ শুধু যুগোপযোগী নীতি বা কর্তব্য হিসেবেই নয়, মনুষ্যত্বের ন্যায় বিচার ও হিন্দু ধর্মের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যেও অবিলম্বে এ ব্যাধি অপসারণ করা দরকার। গোবর ও গোমূত্র নামক পশুমল দ্বারা পবিত্রকরণের হিন্দু ব্যবস্থার ঘৃণ্য ও হাস্যকর বিধান থেকে হিন্দু ধর্মকে মুক্ত করা প্রয়োজন।

উত্তেজনা তীব্র হতে থাকলে ১৯২৭ সালের ৪ঠা আগস্ট হঠাৎ করে মাহাদ মিউনিসিপালিটি এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে চৌদারপুকুরটিকে অস্পৃশ্যদের কাছে উন্মুক্ত রাখার ১৯২৪ সালের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে

নেয়। এ ঘটনা ড. আম্বেদকরের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিলো। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি ১৯২৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের দামোদর হলে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। এতে মাহাদ মিউনিসিপালিটির অবৈধ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখান থেকেই ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর চৌদার পুকুরে সত্যাগ্রহ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ২৫শে ডিসেম্বর পনের হাজার সত্যাগ্রহীর উপস্থিতিতে সম্মেলন শুরু হলো। ইতোমধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি পুকুরটিকে তাদের ব্যক্তিগত দাবী করে কোর্টে কাগজপত্র দাখিল করেছিলো। তাই কোর্ট কর্তৃক পুকুরটি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সত্যাগ্রহ মূলতবী রাখার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহিত হয়। এই সম্মেলনেই ড. আম্বেদকর হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'র তীব্র সমালোচনা করে বলেন-

> 'মনুসংহিতাকে হিন্দু ধর্মের আচরণবিধির পবিত্র গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। মনুস্মৃতিকে ব্রাহ্মণ জগদীশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, শূদ্রের সম্পদ অর্জনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছে। যে কোন বর্ণের নারী ব্রাহ্মণদের উপভোগের বস্তু। গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ্যবাদের কালাকানুন এবং সভ্যসমাজের কলঙ্ক। কাজেই গ্রন্থটিকে অবিলম্বে ভস্মীভূত করা প্রয়োজন।'

তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সম্মেলনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলো। ফলে এই সম্মেলন থেকেই প্রথম মানবাধিকারের এক সনদপত্র পাশ করানো সহ হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থ মনুস্মৃতির প্রজ্জ্বলন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং সর্বসম্মতিক্রমে ২৫ ডিসেম্বর রাত ৯টায় সোচ্চার ধিক্কার ও বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্য দিয়ে সর্বসমক্ষে 'মনুস্মৃতি'র বহ্ন্যুৎসব করা হয়।

এদিকে পরবর্তী তিন বছর ধরে চলা চৌদার পুকুরের মামলায় শেষপর্যন্ত অস্পৃশ্যরাই জয়লাভ করলো। আর এই মাহাদ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই অল্প সময়ের মধ্যে ড. আম্বেদকরের পক্ষে সারা ভারতে তফসীলি বা দলিত আন্দোলনও গড়ে তোলা সম্ভব হলো।

সাইমন কমিশন রিপোর্ট

১৯২৮ সালের প্রথম সপ্তাহে ভারতের সমস্যাবলী সমীক্ষা করার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি বৃটিশ প্রতিনিধি দল বোম্বাই আসে যা 'সাইমন কমিশন' (Simon Commission) নামে পরিচিত। এখানে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত না করায় ভারতীয় কোন রাজনৈতিক দলই এই কমিশনকে স্বাগত জানায়নি। এই সময় কংগ্রেস কর্তৃক হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, শিখ, দ্রাবিড় ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রভৃতি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহূত হলেও এই সম্মেলনে নির্যাতিত শ্রেণীর কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে সাইমন কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য আইন সভার সদস্যদের নিয়ে প্রত্যেক প্রদেশের গঠিত কমিটিতে বোম্বাই থেকে আম্বেদকর মনোনীত হন। নির্যাতিত শ্রেণীর ১৬টি সংস্থা সাইমন কমিশনের কাছে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানায়। ড. আম্বেদকর তাঁর 'বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা'র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত আসনে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য পৃথক আসন দাবী করেন। শেষাবধি কমিশনের সাথে ঐকমত্যে আসতে না পেরে তিনি দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও ঐক্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে আলাদাভাবে রিপোর্ট

পেশ করেন। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ড. আম্বেদকর সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি পান।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে আম্বেদকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় নির্যাতিতদের নিয়ে নাগপুরে এক সম্মেলন সভায় তিনি বলেন-

> 'জাতিধর্ম নির্বিশেষে অখণ্ড জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে ভারতীয়দের পক্ষে স্বাধীন সরকার গঠন সম্ভব। তবে সংবিধান তৈরিকালীন সময়ে বিভিন্ন জাতির সুবিধা অসুবিধার দিকসমূহ বিবেচনার দাবী রাখে। ... এক দেশের উপর অন্য দেশের শাসন যেমন বরদাস্ত করা যায় না, তেমনি কোন জাতি বা শ্রেণীর শাসনকে ভাল বলে মেনে নেওয়া যায় না।'

মন্দির প্রবেশ অভিযান

আম্বেদকরের উস্কে দেয়া দলিত আন্দোলন ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্নস্থানে এই আন্দোলন নির্যাতিতদের শত শত বছরের নিষিদ্ধ থাকা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আন্দোলনেও একাত্ম হয়ে পড়ে। এসব আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে মন্দির ও পূজা কমিটি অস্পৃশ্যদের পূজামণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। কোথাও কোথাও সংঘর্ষের রূপ নেয়। ইতোমধ্যে বর্ণবাদী হিন্দু প্রতিনিধি গান্ধিজী মন্দির প্রবেশের এসব আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন কূট কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। আম্বেদকর বুঝতে পারছিলেন যে গান্ধিজীও আসলে হরিজনদের মন্দির প্রবেশের অনশন আন্দোলনের নামে এক কূট-রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন। তাই তার অনুগামী সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলে দিলেন যে কোন মানুষের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে দেখলে তাকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ভেবে অবতারে পরিণত করাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রচলিত রেওয়াজ। তারা অস্পৃশ্যরা যেন কখনও তাঁর (আম্বেদকর) উপর দেবত্ব আরোপ না করেন। একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই তাদের পার্থিব দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তিনি আরো বলেন-

> 'ভগবানের প্রতি ভক্তি, কোন মহাত্মার পেছনে ছোটা, তীর্থ গমন, অনশন বা উপবাসে মুক্তি মিলবেনা, মুক্তি মিলবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।'

লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Confarence) যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো। এখানে মহাত্মা গান্ধী, মহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ কে ফজলুল হক, শিখ নেতা উজ্জল সিং প্রমুখ ভারতের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন রাজ্যের ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাথে ভারতের বড়লাট কর্তৃক এই প্রথম দলিত প্রতিনিধি হিসেবে ড. আম্বেদকরও আমন্ত্রিত হন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের সমস্যাকে মামুলি ব্যাপার বলে উপেক্ষা করতে চাইলেও আম্বেদকর দলিত সম্প্রদায়ের পক্ষে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে কড়া যুক্তিসহকারে বিভিন্ন দাবী দাওয়া উত্থাপন করেন। শেষপর্যন্ত এই গোলটেবিল বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মূলতবি হয়ে গেলো।

ঐতিহাসিক পুনা চুক্তি

১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে 'ফ্রান্সাইজ কমিটি'র আহ্বানে কমিটির সদস্যদের সাথে আম্বেদকর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে সর্বত্রই তাঁর উদ্যোগে নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেরা কমিটির কাছে তাদের পৃথক নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন।
তখন কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এম.সি রাজা। তিনি প্রথমে ড. আম্বেদকরের পৃথক নির্বাচনের সক্রিয় সমর্থক হলেও পরবর্তীতে ড. মুঞ্জের সাথে একত্রে সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবী জানিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করে আম্বেদকরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলেন।

ড. আম্বেদকর পূর্বে সংরক্ষিত আসনে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সাইমন কমিশনে উক্ত দাবী করেছিলেন। কিন্তু আম্বেদকরের এই দাবী গান্ধিজী মেনে নিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় নির্যাতিত জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ড. আম্বেদকরও পৃথক নির্বাচনের জোরালো দাবী তোলেন। এই দাবীর সমর্থনে সারা ভারতে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয় এবং নির্যাতিত শ্রেণীর অনেক সংগঠন এই দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসে।

১৯৩২ সালের ১লা মে 'ফ্রান্সাইজ কমিটি'র অধিবেশন শেষ হয়। এই কমিটি কর্তৃক নির্যাতিত শ্রেণী বলতে কাদেরকে বুঝাবে তার একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা তৈরি করা হয়। তা অনুসারে হিন্দু সমাজের যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য করা হয় তারাই 'নির্যাতিত শ্রেণী' (Depressed Classes) নামে চিহ্নিত হবে।
এ প্রেক্ষিতে ৭ মে নাগপুরে ১৫/২০ হাজার লোকের সমাবেশের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় দলিত বা নির্যাতিত শ্রেণীর মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. আম্বেদকরের দাবীকে সমর্থন করে নির্যাতিতদের পৃথক নির্বাচনের দাবী সমর্থিত হয় এবং রাজা-মুঞ্জে ফ্যাক্টকে নির্যাতিত শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়।
এদিকে এম.সি রাজার ডিগবাজীর কারণে বিচলিত আম্বেদকর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং শীঘ্রই লন্ডনের পথে যাত্রা করেন। ১৯৩২ সালের ৭ জুন লন্ডনে পৌঁছে দাবী সম্বলিত ২২ পৃষ্ঠার এক স্মারকলিপি ব্রিটিশ কেবিনেটে পেশ করেন এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে নির্যাতিত শ্রেণীর অনেক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের অবহিত করান।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বন্টনের রায় ঘোষিত হয়। এতে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য প্রাদেশিক আইন সভায় পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং দ্বৈত ভোটাধিকারের ব্যবস্থাও স্বীকৃত হয়। এই দ্বৈত ভোট পদ্ধতি হলো- একটি ভোট নিজেদের প্রার্থীকে এবং অন্যটি সাধারণ প্রার্থীকে প্রয়োগ করতে পারবে। এছাড়া ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। ফলে পার্লামেন্টে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় হিন্দু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক বন্টনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক খবর ছাপতে থাকে। এতে সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হলেন পুনার যারবেদা জেলে অবস্থানরত বর্ণ হিন্দুদের প্রধান স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিভূ মহাত্মা গান্ধী। এই সাম্প্রদায়িক বন্টনের ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নির্যাতিত শ্রেণীর বহু প্রত্যাশিত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই প্রথম গান্ধিজী আমরণ অনশনের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

গান্ধিজীর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। গান্ধিজীর জীবন রক্ষার জন্য কেউ কেউ ড. আম্বেদকরের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করলেন। অসংখ্য টেলিগ্রাম ও পত্র মারফত কেউ সাম্প্রদায়িক বন্টনের দাবী ত্যাগের অনুরোধ করতে লাগলেন, কেউ বা ড. আম্বেদকরের জীবননাশের হুমকি দিতে লাগলেন, আবার কেউ সাম্প্রদায়িক বন্টনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার অনুরোধ জানালেন। আম্বেদকর তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। নির্যাতিত জনগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে তিনি নারাজ। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের সমস্যাকে যে গান্ধিজী মামুলি ব্যাপার বলে উপেক্ষা করেছিলেন, অথচ আজ তিনি সেই মামুলি সমস্যার জন্য কেন আমরণ অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন ?

ড. আম্বেদকর প্রশ্ন তোলেন-

> গান্ধিজী তো ইংরেজদের দেশ ছাড়তে, মুসলমান বা অন্যান্য সংলঘুদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে বা সমাজ থেকে চিরতরে অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটন করতে কোনদিন আমরণ অনশনে যাননি। আসলেই তিনি শক্ত মাটিতে পদাঘাত করার মত মুর্খ নন। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনে যদি ভারতের জাতীয়তা নষ্ট না হয় তাহলে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনে ভারতের জাতীয়তা নষ্ট হবে কেন ?

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধিজীর আমরণ অনশন শুরু হয়ে গেলে ১৯৩২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের 'ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বার হলে' পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে বর্ণবাদী হিন্দুদের একটি সম্মেলন আহুত হয়। এই প্রথম এরকম একটি সম্মেলনে ড. আম্বেদকর আমন্ত্রিত হলেন। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ড. মুঞ্জে, ড. সোলাংকি, চিমন লাল শীতলবাদ, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. দেশমুখ, ড. সাভারকর, মানু সুবেদার, কমলা নেহেরু, তেজ বাহাদুর সপ্রু, চৈত রাম, অ্যানি বেসান্ত, ঠক্কর, কে নটরাজন ও পি.ও গিদওয়ানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রথমে ড. আম্বেদকর তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন-

> ...এটা দুঃখের বিষয় যে, গান্ধিজী নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেছেন। সকলে যে তাঁর মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনারা হয়তো আমাকে নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে গুলি করে মারতে পারেন, কিন্তু আমি যে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যভার গ্রহণ করেছি তা থেকে আমি বিচ্যুত হতে পারবো না। গান্ধিজী কোন বিকল্প প্রস্তাব না রাখায় আমি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা বরং গান্ধিজীকে এক সপ্তাহের জন্য অনশন বন্ধ রাখতে অনুরোধ জানান এবং এই সময়ের মধ্যে কোন না কোন একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রস্তাব চালাচালি শুরু হলো। কিন্তু দুপক্ষের কারো প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না। এদিকে গান্ধিজীর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচেছ। বিষয়টি ড. আম্বেদকরকে চিন্তিত করে তুললো। কেননা কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে গান্ধিজীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভারতে অস্পৃশ্য নির্যাতিত শ্রেণীর উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ব্যাপক হতাহত হবার তীব্র সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগলো। উপায়ান্তর না দেখে ড. আম্বেদকর ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে একটা আপোষ রফায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আপোষ চুক্তিতে গান্ধিজী যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তা অভিনব। কার্যোদ্ধারের জন্য পরম শত্রুর কাছেও পরম মিত্রের অভিনয় করার দক্ষতা। ফলে বৃটিশরাজ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বন্টনের ভোট

পদ্ধতিতে বন্টিত ৭৮ টি আসনের পরিবর্তে নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য এখন ১৪৮ টি আসনে বৃদ্ধি করা হলো বটে, কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাদের কাছ থেকে দ্বিতীয় ভোটাধিকার হরণ করে নেয়া হলো। যার মাধ্যমে অস্পৃশ্যরা সহজেই পৃথকভাবে নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করতে পারতো, সেই পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হলো। এই চুক্তি ভারতের ইতিহাসে 'কুখ্যাত পুনা চুক্তি' (Poona Pact) নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

স্ত্রীবিয়োগ

১৯৩৫ সালে বোম্বাই সরকারি আইন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। দু'বছর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এদিকে ছোটকাল থেকে লালন করে আসা সুপ্ত স্বপ্নটিকে এবার বাস্তবায়ন ঘটাতে লাগলেন। বোম্বাইর দাদারের হিন্দু কলোনীতে নিজের মতো করে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করলেন যার উপর তলায় হলো ৫০ হাজারেরও অধিক পুস্তক পরিপূর্ণ একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী। বাড়ির নাম রাখলেন 'রাজগৃহ'। যে নামটির সাথে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ইতিহাস জড়িত। কিন্তু এ সুখও সইলো না তাঁর। এ বছরেই ১৯৩৫ সালের ২৭শে মে দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হলো। তাঁর জীবনের সাফল্যের নেপথ্যে যে ধর্মপরায়ণা, পতিপরায়ণা ও সাংসারিক কাজে কর্মনিষ্ঠ ত্যাগী মহিলার অবদান পরতে পরতে জড়িত, জীবনের অধিকাংশ সময় পড়াশুনা, সামাজিক, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় যে পরিবারের প্রতি তেমন নজর দেয়ার সুযোগ হয়নি, তাঁর মৃত্যুতে আম্বেদকর বড় নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়লেন। ফলে দিন দিন আরো বেশি করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সচেষ্ট হতে লাগলেন।

স্ত্রীর অনেকদিনের স্বপ্ন ছিলো একবার পান্ধারপুর তীর্থভ্রমণে যাওয়ার। আম্বেদকর বারবার এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্পৃশ্যতা মুক্ত হয়ে যেদিন এক নতুন পান্ধারপুর বানাতে পারবেন সেদিনই তাকে নিয়ে তীর্থে যাবেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন বুকে নিয়েই স্ত্রীর মৃত্যু হলো। বর্ণবাদের কঠিন নিগড় থেকে এখনো হিন্দু সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। এবার তিনি বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের কূপমণ্ডুকতা, অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠলেন। ফলে বর্ণহিন্দুরাও অত্যন্ত নির্দয় ও কটুভাবে অস্পৃশ্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে লাগলো। এর প্রেক্ষিতে এবার তিনি ইয়োলা সম্মেলনের ডাক দিলেন।

ইয়োলা সম্মেলন

১৯৩৫ সালের ১৩ অক্টোবর ইয়োলা সম্মেলনের দিন ধার্য হয়। আসন্ন ইয়োলা সম্মেলনে ড. আম্বেদকর ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন বলে গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো। নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান শুরু হলো। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি স্বাগত ভাষণে বলেন-

> ভারতে হিন্দু ধর্মের নামে চলছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধার পাকাপাকি ব্যবস্থা করাই ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল কথা, 'ভাগ কর ও শাসন কর' এই নীতি ব্রাহ্মণ্যবাদের মৌলিক কৌশল। এই নীতিকে ধর্মের সংগে যুক্ত করে এবং তা চিরস্থায়ী করার জন্য বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠাপূর্বক ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়। তাদের আর একটি কৌশল দেব-দেবীর সৃষ্টি, দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তদের দানীয় বস্তু দেব-দেবীর পক্ষে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক আত্মসাৎকরণ।

এই অনুষ্ঠানে ড. আম্বেদকর তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন-

> ...নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের হিন্দু হয়েও যদি সম অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, বিগত ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা সংগ্রাম করেও তাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র ন্যায়বোধের পরিচয় পাওয়া না যায় তাহলে নির্যাতিত সমাজকে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। তাই দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে আত্মসম্মান ও মানবিক অধিকার লাভ করতে হলে হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। ... আমার চরম দুর্ভাগ্য যে, অস্পৃশ্য সমাজে জন্মেছি বলে আমাকে আত্মসম্মানহীন অপমানজনক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন-

> আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও অস্পৃশ্য হয়ে মরবো না।

এই সম্মেলনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো-

১) অস্পৃশ্যদের সামাজিক সমতা লাভের আন্দোলনের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উদাসীনতা অথবা বিরোধিতাকে এই সম্মেলনে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানায়।

২) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার জন্য বিগত ১৫ বছর ধরে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নির্যাতিত শ্রেণীর হিন্দুদের সমান সামাজিক অধিকার লাভের নিমিত্ত যে আন্দোলন ও সংগ্রাম তারা চালিয়ে আসছে তা এখন থেকে বন্ধ করা হবে।

৩) অতঃপর তারা সমাজে সম্মানজনক ও সমানাধিকার লাভের জন্য ভারতের অন্য যে কোন ধর্ম গ্রহণ করবে।

ইয়োলা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশিত হওয়া মাত্র মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গের কাছ থেকে এদের স্ব-স্ব ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান পত্র আসতে লাগলো এবং ড. আম্বেদকরের ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে সারা ভারতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এর প্রতিক্রিয়ায় নানা জনের নানা মত ব্যক্ত হতে লাগলো। গান্ধিজী ও সমমনা নেতৃবৃন্দ চিন্তা করলেন অস্পৃশ্যরা যদি হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাবে এবং এই অনুপাতে কংগ্রেসের শক্তি হ্রাস পাবে। অনেকে আশংকা করলেন ড. আম্বেদকর যদি তার অনুগামীদের নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ভারতে মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেলে হিন্দুদের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ফলে হিন্দু মিশনারী নেতারা আম্বেদকরের সাক্ষাত প্রত্যাশা করলেন। আম্বেদকর স্পষ্ট ভাষায় জানালেন- 'একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হিন্দুধর্ম থেকে অস্পৃশ্যতা তুলে নেয় তবে তারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করবেন না। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের কাছে এ প্রস্তাব কোন গুরুত্ব পেলো না।

পরবর্তীতে অধ্যাপক এন. শিবরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শিবরাজ আম্বেদকরের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে বলেন-

> 'হিন্দু ধর্ম আজ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। অতএব এই ধর্ম পরিত্যাগ করা ছাড়া নির্যাতিতদের আর কোন উপায় নেই।'

একই সম্মেলনে ড. আম্বেদকর বলেন-

> 'হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবনের আর কোন সম্ভাবনা নেই, তাই অতীব দুঃখের সাথে আমাদেরকে হিন্দু ধর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।'

রাজনৈতিক ব্যাপ্তি

১৯৩৬ সালে ড. আম্বেদকর 'ইনডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এই পার্টি কেন্দ্রীয় আইন সভায় ১৫ টি আসন লাভ করে। এ সময় আম্বেদকর The Annihilation of Caste নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এ বইয়ে হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথা ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা করেন। এতে তিনি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে গান্ধী কর্তৃক 'হরিজন' (ঈশ্বরের সন্তান) নামে অভিহিত করার কংগ্রেসীয় সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে ভাইসরয় তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। এই পদ্ধতিতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগদান করবে, কিন্তু রাজ্যে কোন দায়িত্বশীল সরকার থাকবে না। মনোনয়নের ভিত্তিতে প্রতিনিধি করা হবে। এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দেন কংগ্রেস সভাপতি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মুসলিম লীগ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির পক্ষে ড. আম্বেদকর। হিন্দু মহাসভা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের এই প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা সমালোচনা চলতে লাগলো।
এ সময় কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গান্ধিজীর সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতির পদ ও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভাইসরয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখেন।

তৎকালীন ভারতীয় ভাইসরয় লর্ড লিন লিথগো অক্টোবর মাসে ভারতীয় নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। এদের মধ্যে গান্ধিজী, নেহরু, ড. আম্বেদকর, জিন্নাহ, সাভারকর, বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাস বসু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সাক্ষাতে ড. আম্বেদকর বলেন- পুনা চুক্তির ফলাফলে তারা খুবই ক্ষুব্ধ এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনা হলে তাদের আরো বক্তব্য আছে। কিছুদিন পর ভাইসরয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হলে কংগ্রেস অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং সমস্ত প্রদেশ থেকে তাদের মন্ত্রীসভা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর ড. আম্বেদকর বিবৃতি দিলেন যে, গান্ধিজীর একনায়কত্বের মনোভাবই ভারতে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

১৯৩৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা সমূহকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। এ দিনটিকে জিন্নাহ সাহেব 'মুক্তি দিবস' হিসেবে পালন করে। ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলিম লীগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়। এপ্রিল মাসে রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সম্মেলনে ভারত বিভাগকে কোনক্রমেই বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা করে। হিন্দু-মুসলমানের দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের এ প্রস্তাবকে ঘিরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈধতা বাড়তে লাগলো। ১৯৪০ সালে ড. আম্বেদকরের Thoughts on Pakistan বইটি প্রকাশিত হলে ভারতীয় রাজনীতিতে বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে মারাত্মক ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি হয়। এ গ্রন্থের সারকথা হলো, সম্পূর্ণ লোক বিনিময় পূর্বক মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টিই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র বাস্তব ও স্থায়ী সমাধান। দুটি ভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিকতা সম্পন্ন জাতিকে নিয়ে একটি দেশ গড়ে উঠতে পারে না। যে হিন্দুরা নিজেদের একটি অংশকে হাজার হাজার বছরব্যাপী ঘৃণিত ও বঞ্চিত করে রেখেছে তাদের কাছে কোন্ ভরসায় মুসলমানরা উদারতা ও সমমর্যাদা আশা করবে ? আম্বেদকরের প্রস্তাবে জিন্নাহ সাহেব ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস লোক বিনিময়ের এ প্রস্তাবকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়।

রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আম্বেদকর গণভোট সংক্রান্ত একটি ফর্মূলা সরকারের কাছে পেশ করেন। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে দু'টি গণভোটের ব্যবস্থা করাই এই ফর্মূলার বিষয়। প্রথম গণভোটে মুসলমানরা ঠিক করবে তারা পাকিস্তান চায় কিনা। যদি মুসলিমরা পাকিস্তান চায় তবে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে অমুসলিমদের গণভোট হবে যে তারা পাকিস্তানে থাকতে চায় কিনা। যদি না চায় তাহলে উক্ত প্রদেশ চায় কিনা। যদি না চায় তাহলে উক্ত প্রদেশ সমূহে সীমানা কমিশন গঠন করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ নির্ধারণ করা হবে এবং মুসলমানরা রাজী থাকলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতভুক্তিও ড. আম্বেদকরের উক্ত ফর্মূলার বাস্তবায়ন।

যদিও ১৯৪৫ সালে Thoughts on Pakistan এর দ্বিতীয় সংস্করণ Pakistan or Partition of India গ্রন্থে কিছু নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। সংযোজিত নতুন অধ্যায়ে বলা হয়-

> পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে একাধিক জাতি একই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বসবাস করছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টি না করেও মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি হিসেবে স্বাধীন ভারতে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নিয়ে বসবাস করতে পারবে। সংবিধান রচনাকালে তাদের পৃথক সত্তা সম্পর্কে সংবিধানসম্মত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কিন্তু এ প্রস্তাব আর তৎকালীন নেতৃবৃন্দের কাছে গৃহীত হয়নি।

১৯৪১ সালের জুলাইয়ে ভাইসরয় কয়েকজন ভারতীয়কে নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা কমিটি এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা কমিটিতে ড. আম্বেদকরকে অন্তর্ভুক্ত করলেও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নির্যাতিত শ্রেণীর ও শিখদের মধ্য থেকে কোন প্রতিনিধি না নেওয়ায় আম্বেদকর ব্রিটিশ সরকারের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ পর্যন্ত নির্যাতিত শ্রেণীর যুবকদের নিয়ে গঠিত 'মাহার ব্যাটেলিয়ান' ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে আসলেও বর্ণহিন্দুদের প্ররোচনায় অস্পৃশ্যতার ধূয়া তুলে ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকারের এক আদেশ বলে অস্পৃশ্যদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয। ড. আম্বেদকরের আপ্রাণ চেষ্টায় বৃটিশ সেনাবাহিনীতে পুনরায় মাহারদের (অস্পৃশ্য) নিয়োগদান চালু করা হয়।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতের রাজনৈতিক অচলবস্থা নিরসনকল্পে ভারতে আসেন। ৩০ মার্চে এক সাক্ষাতকারে ক্রিপস ড. আম্বেদকরকে ইনডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির নেতা, না নির্যাতিত শ্রেণীর নেতা হিসেবে তাঁর সাথে আলোচনা করছেন এই প্রশ্ন করলে আম্বেদকরকে সমস্যায় ফেলে দেন। সেদিনই তিনি তার অনুগামী ও অফসিলী নেতাদের নিয়ে দিল্লীতে এক বৈঠকে বসলেন। সারা ভারতে তফসিলীদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ১৮ ও ১৯ জুলাই সারা ভারত তফসিলী সম্মেলনের দিন ধার্য করা হয়।

২রা জুলাই ভাইসরয় তার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আরো ৫ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করলে নির্যাতিত শ্রেণীর পক্ষে এই প্রথম ড. আম্বেদকর ভারত সরকারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে আসীন হন।

১৮ ও ১৯ জুলাই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নাগপুরে আয়োজিত সারাভারত তফসিলী সম্মেলনে ৭০ হাজারের অধিক তফসিলী প্রতিনিধির সামনে আম্বেদকর তাঁর ভাষণে বলেন, তফসিলীরা হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের একটা পৃথক সত্তা আছে যা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেও স্বীকৃত। গান্ধিজীর মতো বর্ণহিন্দু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠিরা তফসিলীদের পৃথক সত্তাকে অস্বীকার করে আত্মসাৎ করার চক্রান্তে লিপ্ত। তফসিলীদের পৃথক জাতিসত্তার ভিত্তিতে এই সম্মেলনে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন All India scheduled castes Federation গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়' ধ্বনি তুলে কংগ্রেস ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয় এবং পরে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গান্ধিজী পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ দিনের অনশন শুরু করেন। ড. আম্বেদকর তখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তার উপর কংগ্রেসী নেতাদের প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শ্রমিকদের জীবনের মানোন্নয়নের কথা চিন্তা করে কতকগুলো কমিশন গঠন করে কিছু উদ্যোগ নিতে থাকেন।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে আম্বেদকরের What Congress and Gandhi have done to the untouchables? নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তা ভারতীয় রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। এ বছর জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে টোরীদের ভরাডুবি হলে লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালে ভারতেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। এর পর পরই ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে লাগলো। নির্বাচনে কুখ্যাত পুনাচুক্তির কুফল তফসিলীরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলো। আম্বেদকরের তফসিলী ফেডারেশন কংগ্রেসের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলোা।

এর আগ পর্যন্ত ড. আম্বেদকর ৪ বৎসর শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন নারী, শিশু শ্রমিকসহ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র শ্রমিক সমাজের কল্যাণে কিছু অধিকার বাস্তবায়ন করে গেছেন-

১) শ্রমিকদের বিষয়ে যে কোন আলোচনায় আগে শুধু সরকার পক্ষ এবং মালিকপক্ষ বসতেন। ড. আম্বেদকর শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন ঘোষণা করলেন শ্রমিক সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় শ্রমিক প্রতিনিধিও যোগদান করতে পারবেন। এই পদ্ধতির নাম 'ত্রি-পাক্ষিক' শ্রম আলোচনা।

২) আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের ন্যায় ভারতেও 'Joint Labour Management Committee' বা যৌথ শ্রম পরিচালনা কমিটি গঠন করেন।

৩) বিভিন্ন অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সমিতিকে অধিকার দানের উদ্দেশ্যে 'Trade Union' এর স্বীকৃতি দানের আইন পাশ করেন।

৪) শ্রমিকদের কাজের সময় ১০ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টা ধার্য করা হয় এবং ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে 'Over time salary' প্রদানের আইন পাশ করা হয়।

৫) শ্রমিকদের বেতন, বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, পোশাক আশাক ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার জন্য 'শ্রম অনুসন্ধান সমিতি' গঠন পূর্বক তাদের উন্নয়নের অনেকগুলো আইন পাশ করা হয়।

৬) ‘কারখানা সংশোধনী বিল’ পাশের মাধ্যমে শিল্প ও কারখানা শ্রমিকদের সবেতন ছুটির ব্যবস্থা চালু করেন। এতে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কর্মচারীরা বছরে ১০ দিন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কর্মচারীরা বছরে ১৪ দিন সবেতন ছুটি ভোগ করতে পারবেন। এর আগে সাপ্তাহিক ছুট ছাড়া অন্যান্য দিন ছুটি ভোগ করলে মালিক কর্তৃক বেতন কর্তন করে নেয় হতো।

৭) নারী শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে পুরুষ শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বৈষম্যের বিলোপ সাধন। এই কাজের জন্য নারী পুরুষ সমহারে বেতন পাবেন।

৮) কয়লা শ্রমিকদের আর্থিক উন্নয়নকল্পে ‘কয়লা খনি শ্রমিক উন্নয়ন তহবিল’ গঠনের আইন পাশ।

৯) প্রসবকালীন ‘Maternity Leave’ ছুটির আইন বিধিবদ্ধ করেন।

সংবিধানের স্থপতি ড. আম্বেদকর

১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'স্বাধীন ভারত' হিসেবে আইন পাশ করা হলে গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাজনের ফলে গণপরিষদও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ড. আম্বেদকর পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার কর্তৃক জয়লাভ করে গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে দেশ বিভাজনের ফলে তার সদস্যপদও খারিজ হয়ে যায়। এ সময় ড. এম.আর জয়াকর গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করায় ড. আম্বেদকর কংগ্রেসের সমর্থনে পুনরায় মহারাষ্ট্র থেকে গণ পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

এদিকে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরির দায়িত্ব ড. আম্বেদকরের উপর ন্যস্ত হবার সুযোগে তিনি রাজর্ষি সম্রাট অশোকের রাজকীয় স্মারক 'অশোক চক্র' জাতীয় পতাকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

২৯ আগস্ট গণপরিষদ কর্তৃক সর্বশ্রী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন ধাবরাও, স্যার বি.এন.রাও, যুগল কিশোর খান্না, সৈয়দ সাদুল্লা, এস.এন.মুখার্জী ও কেবলকৃষ্ণকে সদস্য এবং ড. আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে একটি খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি খসড়া সংবিধান সম্পূর্ণ করে গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে হস্তান্তর করেন। অতঃপর সংবিধানটি জনমত যাচাইয়ের জন্য ৬ মাস সময় নেয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর ড. আম্বেদকর খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদে পেশ করেন।

এই সংবিধান রচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী কিছু কিছু ধারা পার্টির হাই কমান্ডের চাপের মুখে সংযোজন করতে হয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের পরামর্শও শুনতে হয়েছে। ফলে অনেক সময় নিজেদের অভিরুচি ও স্বাধীন বিবেচনা মাফিক কাজ করতে পারেননি বলে সংবিধান কমিটির সদস্য এম.সাদুল্লা ও অনেকেই স্বীকার করেন। তবু এই সংবিধান ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরির জন্য যত বেশি সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক খসড়া সংবিধানকে স্বাধীন ভারতের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে সভাপতির ভাষণে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ড. আম্বেদকরকে খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান নির্বাচন করাকে একটি নির্ভুল সিদ্ধান্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন- 'আমি সভাপতি হিসেবে বলতে চাই, আমরা ভারতের সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভার অর্পন করেছিলাম।'

দ্বিতীয় বিয়ে

১৯৩৫ সালে স্ত্রী রমাবাঈয়ের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন আম্বেদকর। ফলে বেশি করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে সচেষ্ট করতে গিয়ে সীমার অতিরিক্ত যে শারীরিক ও মানসিক চাপে পড়েছেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই তা তাঁর শরীর মন বইতে পারছিলো না। ফলে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে গিয়ে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে হতো তাঁকে। কিন্তু হাসপাতালে পড়ে থাকার ব্যক্তিও তিনি নন। আর এ অনিয়মের কারণে বারবারই তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যেতেই হয়। সে হাসপাতালের ডাঃ শ্রীমতি সারদা কবির চিকিৎসা করতেন। তিনি ড. আম্বেদকরের চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রূষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এভাবে দীর্ঘ চিকিৎসা জীবনে রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে গড়ে ওঠা সখ্যতা একটু একটু করে হৃদয়ঘটিত সম্পর্কে মোড় নেয়।

রমাবাঈয়ের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় কোন রমণীর দারপরিগ্রহ না করার সংকল্পবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করলেও ক্রমবর্ধমান শারীরিক ও মানসিক চাপ এবং জীবন-যাপনে বিশ্রামহীন অনিয়ম ও নৈকট্যসঙ্গের অভাবে যখন দৈহিক অবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়ছিলো, সেই সময় ডাঃ সারদার সাহচর্যে সেই অভাব অনেকটা লাঘব হতে চলছিলো। ব্যক্তি জীবনে এরকম একজন দরদী ও সহানুভূতিশীল সঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৫ এপ্রিল ৫৭ বছর বয়সে নয়াদিল্লীর ১নং হার্ডিঞ্জ এভিনিউস্থ স্বীয় বাসভবনে ড. আম্বেদকর ও ডাঃ শ্রীমতি সারদা কবির রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শেষপর্যন্ত সারদা কবির নিঃসন্তান ছিলেন। আম্বেদকরের এই বিয়ের সিদ্ধান্তে সর্বত্র অনেক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেলো।

হিন্দু কোড বিল ও মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ

হিন্দু আইনের সংস্কারের নিমিত্তে ১৯৪১ সালের দিকে গঠনকৃত একটি কমিটি 'হিন্দু কোড বিল' নামে একটি খসড়া বিল তৈরি করে। 'হিন্দু কোড বিল' মূলত হিন্দু নারী সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধানের সংস্কার। ১৯৪৭ সালে ড. আম্বেদকর কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে হিন্দু কোড বিল তাঁর হস্তগত হলে তিনি এই বিলকে আরো ঢেলে সাজালেন। বিশেষ করে যৌথ পরিবারের ক্ষতিকর প্রভাব, মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নতুনত্ব আনতে চাইলেন। এতে হিন্দু গোঁড়াপন্থীরা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠলেন এবং প্রগতিবাদীরা তাঁকে স্বাগত জানালেন।

১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার পূর্ব পর্যন্ত 'হিন্দু কোড বিল' নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় বইতে লাগলো। পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিল পাশ না হলে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলেও ঘোষণা দেন। অন্যদিকে সরদার প্যাটেল ও ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বিলটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৯৫১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ড. আম্বেদকর বিলটি পার্লামেন্টে পেশ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত এই বিলটির উপর প্রচণ্ড বিতর্ক চলার পর অবশেষে বিলটি মূলতবী রাখা হয়।

এপ্রিল মাসে দিল্লীতে আম্বেদকর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে ড. আম্বেদকর তফসিলীদের প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাবের অভিযোগ তুলে বক্তব্য রাখলে মন্ত্রী সভায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আম্বেদকরকে তাঁর অসন্তোষের কথা জ্ঞাপন করেন এবং মন্ত্রী সভা পুনর্গঠনের নিমিত্তে পদত্যাগ করার কথাও ব্যক্ত করেন। এ পরিস্থিতিতে আম্বেদকর তাঁর অনুগামীদের সাথে আলোচনার জন্য বোম্বাই যান এবং তাদের সাথে আলোচনা করে পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনে 'হিন্দু কোড বিল' পাশ না পর্যন্ত পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত হয়।

কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি বোর্ডেও অধিকাংশ সদস্য বিলটির বিরোধিতা করলে নেহেরু বাধ্য হয়ে বিলটি সম্পর্কে পার্লামেন্টে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অনুমতি দিতে হলো। শেষ পর্যন্ত বিলটি দু অংশে বিভক্ত করে এক অংশকে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিধি নামে পার্লামেন্টে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ড. আম্বেদকর এতে সম্মতি দিলেন, তবে এই অংশের আলোচনার জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হলে অনেকেই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। পার্লামেন্টের ভিতরে বাইরে এত তীব্র অসন্তোষের কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ড. আম্বেদকরকে বিলটি তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে বিলটি আর পাশ করানো সম্ভব হলো না। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ড. আম্বেদকর এ ঘটনায় খুবই আঘাত পেলেন এবং ২৭

সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদত্যাগের কথা জানিয়ে দেন। কয়েকটি সরকারি বিলে তাঁর বক্তব্য রাখার বিষয় পূর্ব নির্ধারিত থাকায় তিনি সৌজন্যের খাতিরে সে বিলগুলোর উপর আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৫১ সালের ১১ অক্টোবর পার্লামেন্টে বক্তব্য পেশ করতে এলে লোকসভার ডেপুটি স্পীকার আম্বেদকরের বক্তব্যের একটি কপি তাঁর কাছে জমা দিতে বলায় আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা লাগে এবং বক্তব্য না রেখেই তিনি লোকসভা ত্যাগ করে চলে যান। পরের দিন সংবাদ পত্রে ৫টি বিশেষ কারণ উল্লেখপূর্বক তাঁর পদত্যাগের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

ধর্মান্তর পর্ব

ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠি অস্পৃশ্য জনগণকে একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মীয় অধিকার দিতে নারাজ অন্যদিকে তাদেরকে হিন্দু বলে স্বীকৃত দিতেও অনিচ্ছুক। তাই ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত ইয়োলা সম্মেলনে অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদা আদায়ের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস তথা বর্ণবাদী হিন্দু সংগঠনগুলোর কাছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছিলো এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত না হলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগের হুমকিও দিয়েছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় ১৯৩৬ সালে ১৯ এপ্রিল এক সভায় 'হিন্দু ধর্ম ত্যাগ কমিটি'ও গঠিত হয়েছিলো। এরপর সামাজিক রাজনৈতিক বহু ডামাডোলের মধ্য দিয়ে আরো অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও হিন্দু ধর্ম তাঁর কূপমণ্ডুকতা থেকে বের হতে তো পারেই নি, অস্পৃশ্যদের ব্যাপারেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এতটুকু উন্নতি হয়নি। এ নিয়ে হিন্দু সমাজের ধর্মগ্রন্থ ও অন্ধকার দিকগুলো নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক প্রচুর লেখালেখিও করে গেছেন তিনি। কিন্তু এতেও তাদের একটুও উন্নতি হয়নি এবং হবার সম্ভাবনাও দেখা গেলো না। আম্বেদকর তাই এতকাল ভেতরে লালন করে রাখা বৌদ্ধদর্শনের মানবিক সমৃদ্ধির বিষয়গুলো সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। তা যে বহুকাল ধরে তিনি ভেতরে লালন করে আসছেন, তাঁর কর্মকাণ্ডে তা তাঁকে এক অভূতপূর্ব মানবিক শক্তি যুগিয়ে গেছে, তাঁর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ড. আম্বেদকরের 'আমার জীবন দর্শন' নামক এক বক্তৃতা প্রচারিত হয়। সেখানে তিনি বলেন-

> 'তিনটি শব্দের মধ্যে আমার জীবন দর্শন খুঁজে পাই। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। যদিও আমরা ভারতীয় সংবিধানে রাজনৈতিক কারণে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতিকে গ্রহণ করেছি বস্তুত আমাদের সমাজ জীবনে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলো আমি বুদ্ধের বাণী থেকে গ্রহণ করেছি। হিন্দু ধর্মে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কোন স্থান নেই, তাই বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করলে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ পরস্পরের পরিপূরক হবে।'

সে বছরই ডিসেম্বর মাসে ড. আম্বেদকর সস্ত্রীক তাঁর একান্ত সচিব মিঃএস.ভি সবদকরকে নিয়ে রেঙ্গুনে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বলেন-

> '...বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থা যদি সহায়তা করে তাহলে আমি বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতে বুদ্ধের করুণা ও সাম্যের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করবো।'

ভারতীয় জাতীয় পতাকায় অশোক চক্র, জাতীয় প্রতীক হিসেবে অশোক স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসকে সর্বভারতে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা থেকেই বুঝা যায় যে, অনেক আগে থেকেই তিনি বুদ্ধকে হৃদয়ে ধারণ করে নিয়েছিলেন। রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরেই লুনার নিকটবর্তী দেহু রোডে তিনি এক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন এবং সেখানে রেঙ্গুন থেকে আনীত একটি বৌদ্ধ মূর্তি প্রতিস্থাপন করেন। মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০ হাজার জনতার উপস্থিতিতে তিনি জানিয়ে দেন অচিরেই তিনি তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বুদ্ধ ও তাঁর বাণী' প্রকাশ করবেন।

আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দেশ বিদেশের বহু বৌদ্ধ সোসাইটি থেকে অভিনন্দন আসতে লাগলো। এদিকে আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে লাগলো, শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে তাঁকে প্রায়ই অক্সিজেন ব্যবহার করতে হচ্ছে। তার পরও তাঁর কলম থেমে থাকলো না। Revolution and Counter Revolution in India, Buddha or Karl Marx, The Riddless in Hinduism নামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনায় প্রচুর ব্যস্ত তিনি। ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Buddha and his Gospel বুদ্ধ ও তাঁর বাণীর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। ২৪ মে বোম্বাইয়ের নারে পার্কে অনুষ্ঠিত বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আগামী অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি হিন্দুধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন। সে বছর মে মাসেই বি.বি.সি (ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশান)-এ দেয়া 'কেন আমি বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি' শীর্ষক প্রচারিত এক বক্তৃতায় বলেন-

> 'আমি তিনটি নীতির জন্য বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি। প্রথমটি হলো প্রজ্ঞা (অলৌকিক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত জ্ঞান), দ্বিতীয়টি হলো করুণা (প্রেম অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা) এবং তৃতীয়টি হলো সাম্য (সমতা অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে সমান মনে করা)।

জুন মাসের দিকে ড. আম্বেদকরের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ২৩ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করা হলো যে, আগামী ১৪ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিনে বেলা ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নাগার্জুনের জন্মস্থান নাগপুরে ড. আম্বেদকার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা পর্ব সম্পন্ন করবেন। দীক্ষাদানের জন্য গোরক্ষপুরের কুশীনারাতে অবস্থানরত অশীতিপর বৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু চন্দ্রমণিকে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানালেন। কলকাতা মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক ডি. ঊলিসিনহাকেও দীক্ষানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাছাড়া তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী, অনুগামী যারা তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারাও যেন উক্ত দিবসে পরিচ্ছন্ন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে নাগপুরে উপস্থিত হন সেজন্য তাদের প্রতি আবেদন জানালেন।

দীক্ষা দিবসের তিনদিন পূর্বে আম্বেদকর সস্ত্রীক নাগপুরে চলে গেলেন। তাঁকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমনে নাগপুর মুখরিত হয়ে ওঠলো। নাগপুরের শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৪ একর জায়গা নিয়ে তৈরি করা হলো ঐতিহাসিক দীক্ষাভূমি। ১৩ অক্টোবর আহূত এক প্রেস কনফারেন্সে ড. আম্বেদকর জানালেন-

> 'আমি যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা হবে আধুনিক সমাজ জীবনের ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের এক নবতর রূপ, যার নাম হবে নবযান। আমি বিগত ৩০ বছর ধরে হিন্দুধর্মকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্দোলন করে আসছি। কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি হিন্দুধর্মের স্তরে স্তরে অসাম্য বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির

মতলব ত্যাগ না করাতে বাধ্য হয়ে অনুগামীদের নিয়ে আমাকে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করতে হচ্ছে এবং অন্য কোন ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে ভারতীয় সংস্কৃতিই অটুট থাকবে বলে আমি মনে করি।'

১৪ অক্টোবর সকাল ন'টায় শ্বেতবস্ত্রে সুসজ্জিত আম্বেদকর, তাঁর স্ত্রী ও একান্ত সচিব দীক্ষাভূমির ডায়াসে উঠে একান্ত সচিবের কাঁধে হাত রেখে অন্য হাতে তাঁর লাঠিটি উঁচু করে ধরতেই লক্ষ কণ্ঠের আনন্দ ধ্বনিতে সারা নাগপুর শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠে। মারাঠি ভাষায় রচিত এক প্রশস্তি সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ৮৩ বছর বয়স্ক ভিক্ষু চন্দ্রমণি মহাস্থবির তাঁদের দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেন।

স্বয়ং দীক্ষাগ্রহণের পর আম্বেডকর তাঁর প্রায় ৪ লক্ষ অনুগামীকে দীক্ষাপ্রদান করেন। পরের দিন একই দীক্ষাভূমিতে এক লক্ষাধিক জনতা দীক্ষা গ্রহণ করেন। ত্রিরত্ন এবং পঞ্চশীল গ্রহণের পর তাঁরা সম্মিলিতভাবে ২২টি শপথ গ্রহণ করেন। এরপর ১৬ অক্টোবর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আম্বেডকর অপর একটি গণদীক্ষার আয়োজন করেন এবং সেখানেও নবদীক্ষিত বৌদ্ধগণকে নিম্নোল্লিখিত ২২টি শপথ প্রদান করেন।

১. আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতি কোন বিশ্বাস রাখব না এবং তাদের উপাসনা করব না।

২. আমি রাম এবং কৃষ্ণ, যারা ঈশ্বরের অবতার রূপে পরিচিত, তাদের প্রতি কোন বিশ্বাস রাখব না এবং তাদের উপাসনা থেকে বিরত থাকব।

৩. আমি গৌরী, গণপতি সহ অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীগণের প্রতি কোন বিশ্বাস রাখব না এবং তাদের আরাধনা করব না।

৪. আমি ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করি না।

৫. আমি ভগবান বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকার করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না। আমি মনে করি এই তত্ত্বটি একটি মিথ্যা প্রচারমাত্র।

৬. আমি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা থেকে বিরত থাকব।

৭. আমি সেই সমস্ত কার্যাবলি থেকে বিরত থাকব যার দ্বারা ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার অবমাননা হয়।

৮. আমি ব্রাহ্মণগণকে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পাদন করতে দেব না।

৯. আমি মানুষের মধ্যে সাম্যে এবং ঐক্যে বিশ্বাস করব।

১০. আমি মানবসমাজে সাম্য এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার্থে আপ্রাণ প্রয়াস করে যাব।

১১. আমি ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত অষ্টাঙ্গ মার্গ অনুসরণ করে চলব।

১২. আমি ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত দশ পারমিতা মান্য করে চলব।

১৩. আমি জগতের সকল জীবের প্রতি দয়া এবং করুণা প্রদর্শন করব এবং তাদের রক্ষা করব।

১৪. আমি চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করব না।

১৫. আমি মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করব না এবং কখনও মিথ্যাচার করব না।

১৬. আমি ইন্দ্রিয়কাম চরিতার্থ করার জন্য কোন অসাধু কার্যে লিপ্ত হব না।

১৭. আমি মদ্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন করব না।

১৮. আমি জীবনে প্রতিনিয়ত অষ্টাঙ্গ মার্গ অনুশীলনের প্রয়াস করব এবং সকলের প্রতি করুণা অভ্যাস করব।

১৯. আমি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করছি কারণ হিন্দুধর্ম মনুষ্যত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। হিন্দুধর্ম বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসমাজে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে এবং সাম্য প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করেছে। তাই আমি বৌদ্ধ ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার ধর্ম হিসেবে অবলম্বন করলাম।

২০. আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম।

২১. আমি বিশ্বাস করি যে আমি জন্মান্তরিত হয়েছি।

২২. আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি ভবিষ্যতে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম দর্শন এবং শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করব।

১৬ অক্টোবর চান্দাতে বিশাল জনতাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে আম্বেদকর দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। ধর্মান্তরের কারণে ভারতের কোন নেতৃবর্গ তাঁকে অভিনন্দন না জানালেও বিশ্বের অনেক দেশ ও নেতৃবর্গের কাছ থেকে অভিনন্দিত হন।

এরপর সারা ভারতব্যাপী ধর্মদীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন তিনি। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে সেই কর্মসূচি পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবু ৩০ নভেম্বর নেপালে অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি সস্ত্রীক গমন করেন। সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও কার্ল মার্কসের উপর গবেষণামূলক ভাষণে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেয়তর পথগুলো সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। এটাই তাঁর জীবনের শেষ বৌদ্ধধর্ম প্রচার।

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিগুলো হচ্ছে

ক) চতুরার্য সত্য-

১) যথা দুঃখ
২) দুঃখ সমুদয়: দুঃখের কারণ
৩) দুঃখ নিরোধ: দুঃখ নিরোধের সত্য
৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ: দুঃখ নিরোধের পথ

খ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ- (তিনটি মৌলিক শ্রেণীতে আটটি উপাদান)

- প্রজ্ঞা

১) সম্যক ধারণা বা দৃষ্টি
২) সম্যক সংকল্প

- শীল

৩) সম্যক বাক্য
৪) সম্যক আচরণ বা কর্ম
৫) সম্যক জীবনধারণ বা জীবিকা

- সমাধি

৬) সম্যক চেষ্টা
৬) সম্যক মনন বা স্মৃতি
৭) সম্যক ধ্যান বা সমাধি

গ) ত্রিশরণ মন্ত্র-
আর্যসত্য এবং অষ্টবিধ উপায় অবলম্বনের পূর্বে ত্রিশরণ মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। এই মন্ত্রের তাৎপর্য:

১) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি - আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। বোধি লাভ জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধত্ব মানে পূর্ণ সত্য, পবিত্রতা, চরম আধাত্মিক জ্ঞান।

২) ধম্মং শরণং গচ্ছামি - আমি ধর্মের শরণ নিলাম। যে সাধনা অভ্যাস দ্বারা সত্য লাভ হয়, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ হয় তাই ধর্ম।

৩) সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি - আমি সঙ্ঘের শরণ নিলাম। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য ধর্মের সাধনা সম্যক্ ভাবে করা যায় তাই সঙ্ঘ।

জীবনাবসান
নেপাল থেকে ফিরে আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটলো। কিছুটা সুস্থ বোধ করলে ২রা ডিসেম্বর অশোক পার্ক বিহারে তিনি নির্বাসিত তিব্বতীয় ভিক্ষু দালাইলামার সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মিলিত হন। পরদিন 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম' গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ের লেখা সম্পন্ন করে কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিট্যাল'-এ চোখ বুলালেন। কার্ল মার্কস সবসময়ই তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিলো। যা তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিভাত হয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগদান করলেন। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তফসিলী ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে আম্বেদর কেন্দ্রীয় লোকসভায় কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে খুব অল্প ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৫২ সালের মে মাসে রাজ্যসভার নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিরোধীদলীয় এমপি হন। ৪ঠা ডিসেম্বরের পর যে আম্বেদকরের মতো একজন প্রতিভাবান সাংসদকে আর লোকসভায় দেখা যাবে না সেটা হয়তো কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। বাসায় ফিরে সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী ১৬ ডিসেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্টিতব্য দীক্ষা সমারোহে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৪ ডিসেম্বর বোম্বাই রওনা দেবেন। ৫ ডিসেম্বর রাত ৮টায় সাক্ষাতপ্রার্থী কয়েকজন জৈন নেতার সাথে নিজ বাসভবনেই বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। রাত ১১টার পর গুনগুন করে 'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামী' গাইতে গাইতে ড. আম্বেদকর নিদ্রামগ্ন হলেন। সবার অগোচরে এটাই তাঁর শেষ নিদ্রা। পরদিন ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ভোর বেলা আম্বেদকর যথারীতি আর জাগলেন না।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মতো দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর বাড়িতে ছুটে এলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, যোগাযোগ মন্ত্রী জগজীবন রামসহ অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ। সেদিন রাতেই তাঁর মরদেহ বোম্বাই নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হলো। যোগাযোগ মন্ত্রী স্পেশাল প্ল্যানের ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করার সমস্ত দায়িত্ব নিলেন। মাথার উপর বুদ্ধের করুণা বিগলিত মূর্তি সম্বলিত ড. আম্বেদকরের মরদেহ ৪ লক্ষ জনতার বিশাল শোভাযাত্রা দাদার শ্বশানক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে তাঁর একমাত্র সন্তান যশোবন্ত রাও মুখাগ্নি করলেন।

ড. আম্বেদকরের আত্মার সৎগতি কামনা করে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর প্রস্তাবে লোকসভা ও রাজ্যসভা একদিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ড. আম্বেদকরের জন্মদিনকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন।

আম্বেদকরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক বিশাল যুগের অবসান ঘটলো। বেঁচে থাকতে যে রাষ্ট্র তাঁকে যথাযথ সম্মান জানাতে পারেনি, তাঁর মৃত্যুর পরও যে জাতি এখনো অস্পৃশ্য বর্ণবাদ মুক্ত হতে পারেনি, সেই ভারত তাঁর মৃত্যুর ৪৪ বছর পর ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারত রত্ন উপাধিতে ভূষিত করে হয়তো পাপস্খালনের কিছুটা প্রয়াস নিয়েছে। তবে এর আগেই বিশ্বব্যাপী দলিত অস্পৃশ্য জাতিগোষ্ঠির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে ড. আম্বেদকরের মৃত্যু দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ৬ ডিসেম্বর-এর আগের দিনটিকে জাতিসংঘ বিশ্ব মর্যাদা দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা করে।

...

কৃতজ্ঞতা: তথ্য সূত্র-

১) ‘মনুসংহিতা’ / সম্পাদনা মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / সুলভ সংস্করণ, বইমেলা ১৪১২, কলকাতা।
২) অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রবক্তা ডঃ আম্বেদকর / সুভাষ কান্তি বড়ুয়া / ১৯৯৮ প্রথম সংস্করণ।
৩) ইংরেজি ও বাংলা ‘উইকিপিডিয়া’, অনলাইন মুক্তবিশ্বকোষ (Wikipedia, the free encyclopedia)।
৪) 'তিতাস' থেকে 'পিতৃগণ' / জাকির তালুকদার।
৫) বিশ্ব মর্যাদা দিবসের ভাবনা ড. আম্বেদকর ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা / ‘সন্তবন্ধু' মাস্টার কানাই লাল রবিদাস, সহসভাপতি, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত অধিকার আন্দোলন এবং আহবায়ক, বাংলাদেশ দলিত ফোরাম। (BPERM)।
৬) ভারতীয় শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা / বাঙ্গাল আব্দুল কুদ্দুস।

...